ঘটিয়াছে। স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিক্ষা যে অবশ্যকর্ত্তব্য ও সমাজের অশেষ মঙ্গলহেতু এ বিশ্বাস তাঁহাদের মন হইতে দূরীভূত হইতেছে।

সে।

মহারাণী বিক্টোরিয়া।

রাজ্যাভিষেক।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই নবীনা মহারাণীর অভিষেক-সমারোহের সূচনা আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব প্রথার কিছু পরিবর্ত্তন করা হইল। পূর্ব্বে যাজকমণ্ডলী ও মন্ত্রীবৃন্দ নবীন সম্রাটের গণ্ডে ছয়শত বার চুম্বন করিতেন। নবীনা মহারাণীর রাজ্যাভিষেকের সময় একেবারে তাহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইল। পূর্ব্বের রাজমুকুট ৭ পাউণ্ড (সাড়ে তিন সের) ছিল, তাহা বালিকা রাজ্ঞীর মস্তকের পক্ষে অতিশয় বৃহৎ। সেই জন্য তাহার অর্দ্ধেক ওজনে নূতন করিয়া একটি রাজ-মুকুট প্রস্তুত হইল। নীলবর্ণের মকমলের মুকুট রৌপ্যের শিকলি যুক্ত ছিল, এবং সেই মুকুট হীরা, মুক্তা, মাণিক্য, মরকত, পোকরাজ, চুণি, পান্না প্রভৃতি নানা প্রকার দুর্ল্লভ অতুলনীয় প্রস্তরে জড়িত হইয়াছিল। ইহার সম্মুখে একটি সুগোল বৃহৎ হীরক ম্যালটিস ক্রশের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তাহার মধ্যস্থলে অতি উজ্জ্বল একখণ্ড মরকত ও তিন কোণা একটি (রুবি) রক্তপ্রস্তর ছিল। এই প্রস্তর খণ্ড ব্ল্যাক প্রিন্স এডওয়ার্ডের * মস্তকে থাকিত। আর সে রাজমুকুটের বিস্তারিত বর্ণনা অনাবশ্যক ও অসম্ভব, তবে ইহাতে ২১৬৬ প্রকারের বিভিন্ন প্রস্তরাদি ছিল এবং ইহার মূল্য হইয়াছিল ১,১৩,০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা। তখন বিখ্যাত কোহিনুর ইংলণ্ডের সম্রাটের করায়ত্ত হয় নাই।

রাজ্যাভিষেকের কয়েক সপ্তাহ, এমন কি কয়েক মাস পূর্ব্বাবধি লোক মুখে অন্য কথা ছিল না। এই অবসরে নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা নানা প্রকারে উপার্জ্জন করিত। কেহ বা রাজ্যাভিষেকের বিষয়ে গান বাঁধিয়া ছাপাইত, কেহ বা ছড়া কাটিত, কেহ বা মেডেল প্রদান করিত। এমন কি এক প্রকার ফিতার নাম "করোনেসন রিবাণ্ড" (অভিষেক-ফিতা) হইল।

অবশেষে যখন সেই রাজ্যাভিষেক দিনের সুপ্রভাত হইল, সেণ্ট জেম্স পার্ক ও টাওয়ারে কামানের ঘন ঘন মাঙ্গলিক ধ্বনি হইতে লাগিল। অতি প্রত্যূষে, পাঁচ ঘটিকার সময় হইতেই, মহা মূল্যবান্ সুন্দর সুসজ্জিত অশ্বযান সকল, সেই চিরপ্রসিদ্ধ ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি অভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। ছয় সাত

---

* ইনি ইংলণ্ডরাজ ৩য় এডওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র। যুবরাজ অতিশয় বীর পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত।

ঘটিকার সময় সমস্ত পথ জনস্রোতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যেন কে শকটের মালা গাঁথিয়া পরে পরে সাজাইয়া দিল। পথে মনুষ্যের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। সুন্দর সুসজ্জিত, পুষ্পদামে পল্লবে বিভূষিত রাজপথের স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিবার জন্য আসন সজ্জিত ছিল, ফুটপাথের উপর ও পার্শ্বে সজ্জিত অশ্বারোহী সৈনিক ও পদাতিক সৈনিক সারি গাঁথিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাজপথের স্থানে স্থানে সাময়িক বাদ্যযন্ত্র লইয়া বাদক শ্রেণী অপেক্ষা করিতেছিল। দশ ঘটিকার সময়, এক বিংশতি কামানের শব্দে মহারাণীকে অভিবাদন করায় সকলে জানিতে পারিল তিনি বকিংহাম প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। আনন্দ হিল্লোলে সকলের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মহারাণী রাজকীয় সুন্দর অশ্বযানে বাহির হইয়াছিলেন, তাহাতে ৮টি তুষার-শুভ্র অশ্ব ছিল। চতুর্দ্দিকে সেই আনন্দোন্মত্ত লোকবৃন্দের হর্ষ-কম্পিত কণ্ঠের জয়-ধ্বনিতে সমগ্র নগরী আন্দোলিত হইতেছিল। ডচেস অফ কেণ্টকে সকলেই সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতে লাগিল। তাঁহার শিক্ষার গুণে দেশবাসী এমন অতুলনীয় করুণাময়ী সাম্রাজ্ঞী রত্ন লাভে সমর্থ হইল। মহারাণীর অশ্ব যানের পর, বিদেশীয় রাজন্যবর্গ ও রাজদূত সকল আসিতেছিলেন। তাহার পর ইংলণ্ডের যত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী মূল্যবান্ যানারোহণ পূর্ব্বক আসিতেছিলেন। সেই সমারোহের সহিত, মধুর বাদ্যধ্বনি ও জয়োল্লাস মিশ্রিত হইয়া অভূতপূর্ব্ব একতান বাদ্য উৎপাদন করিতেছিল।

পথ পার্শ্বস্থ অট্টালিকা সমূহ জন পরিপূর্ণ, চতুর্দ্দিকই যেন নবীন প্রাণে সঞ্জীবিত ও জাগ্রত মনে হইতেছিল। সেই অট্টালিকা-সমূহ সুন্দররূপে পুষ্পমালায়, পল্লবহারে রঞ্জিত পতাকা শ্রেণীতে সুসজ্জিত হইয়া অসংখ্য মানবে পরিপূর্ণ, রমণীদিগের বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত রঞ্জিত বসনে এক অপরূপ দৃশ্য দেখাইতেছিল। সে দৃশ্যের বর্ণনা ভাষায় অসম্ভব। যাঁহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছেন, সে চিত্র তাঁহাদের মানস পটে চিরাঙ্কিত থাকিবে। যখন সেই সমারোহের সহিত মহারাণী রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, দুই পার্শ্বের ব্যক্তি মাত্রেই ঘন ঘন রুমাল উত্তোলন করিয়া হর্ষোন্মত্ত হইয়া জয়ধ্বনি করিতেছিল।

সেই চির-বিখ্যাত আবির অভ্যন্তরে একবার চাহিয়া দেখিলে আর চক্ষু ফিরাইতে কাহারও সাধ যাইত না। তাহার অভ্যন্তর দেশ বেগুনি ও লাল বর্ণের মকমল-মণ্ডিত ছিল, ও তাহার ধারে ধারে সোণালী রঙের ঝালর ঝুলিতেছিল। দুই পার্শ্বে সারি দিয়া প্রহরী সকল (Life Guards) দণ্ডায়মান ছিল। উপাসনার বেদীর উপর চারি পার্শ্বের গ্যালারী সেই প্রকার সোণালী ঝালরে মণ্ডিত ছিল, মধ্যস্থলে বেগুনি ও রক্তবর্ণের মকমলে আচ্ছাদিত ছিল। তাহাতে প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি বসিয়া

ছিলেন। উপাসনা-বেদীর সম্মুখে রাজ-সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল। বেদীর নিকট একটি উজ্জল স্বর্ণ পাত্র ছিল। বেদীর নিম্ন দেশে সেই চির প্রসিদ্ধ "অদৃষ্ট প্রস্তর" (Stône of destiny) ছিল। স্কটলণ্ড দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজ্যাভিষেকের সময় তাহা সিংহাসন রূপে ব্যবহৃত হইত। কথিত আছে বেথেল সহরে য়াকোব সেই প্রস্তর খণ্ডে মস্তক রক্ষা করিয়াছিলেন। বেদীর চারি পার্শ্বের গ্যালারিতে সবুজ বর্ণের পর্দ্দায় স্বর্ণ বর্ণের ঝালোর সজ্জিত ছিল। সেই স্থলে বিদেশীয় রাজদূত, লর্ডস্ ও কমন্স হাউসের সভ্যেরা, প্রধান বিচার-পতিরা আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণপার্শ্বে পিয়ার্সগণ সস্ত্রীক (Peers and Peeresses) আসন পাইয়াছিলেন। সেই সমারোহে উপস্থিত প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষে বহুমূল্য সুবর্ণ ও হীরকালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিলেন। কি উচ্চপদস্থ সৈনিক শ্রেণীর লোক, কি রাজকর্ম্মচারী সকলেই আপন আপন পদ ও অবস্থানুযায়ী মূল্যবান্ বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়াছিলেন। বিদেশীয় রাজদূতেরত কথাই ছিল না! তাঁহারা সেই অতুলনীয় পরিচ্ছদে ও উজ্জল হীরকে সভাস্থল আলোকিত করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। তন্মধ্যে প্রিন্স ইস্টার হেজির চরণের পাদুকা হীরকখচিত ছিল। পিয়ার্স (সম্রান্তগণ) রাজসভার উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পত্নীদের (পিয়ারেসদিগের) সহস্র সহস্র মণি মাণিক্যে যেন সূর্য্যের কিরণের মত আভা ফুটিতেছিল। হারিয়েট মার্টিনিউ লিখিয়াছেন "নয় ঘটিকায় সময় যখন প্রথম সূর্য্যের কিরণ সেই আবির গবাক্ষে ছড়াইয়া পড়িল, তখন পিয়ারেসদিগকে যেন একটি ইন্দ্রধনুর মত দেখাইতেছিল। সেই সূর্য্যের উজ্জল আলোকে বসনের নানা বিচিত্র বর্ণে রত্নালঙ্কারের মধুর প্রভায় নয়ন ঝলসিত করিয়া কেমন মধুর নিদ্রালস আনিতেছিল।"

কেহ কেহ প্রায় সুদীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা কাল সেই ভাবে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। আনন্দ পুলকেও সে যন্ত্রণা অল্প নহে। যখন সহসা সেই সমারোহের কলরব ও মধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, তখন সকলেই আকুল বিস্ময়ে মহারাণীর শুভাগমনের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিলেন। মহারাণী রাজন্যবর্গ, বিদেশীয় রাজদূত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত হইয়া আবিতে প্রবেশ করিলেন। সেই উনবিংশবর্ষীয়া কিশোরী রাণীর আনন কি মধুর—কি পবিত্রতাময় বোধ হইতেছিল। সেই ক্ষীণ সুকুমার বালিকাসুলভ কমনীয় আকৃতিতে কি মহানুভবতা! তিনি দুইজন ধর্ম্মযাজকের সহিত উপাসনা-লয়ের মধ্যস্থলে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তিনি সে দিবস সাম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিলেন, সেই

লাল বর্ণের মকমলের রাজ-পরিচ্ছদে সুবর্ণের ফিতার কারুকার্য্য ছিল, মস্তকের কেশদামে একটি মহামূল্য বিচিত্র সুবর্ণ হার জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সে আননের শ্রী আরও বিকশিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের উচ্চবংশীয়া ৮ জন ডিউক-কন্যা তাঁহার পরিচ্ছদের শেষাগ্রভাগ (train) ধরিয়াছিলেন এবং সখীরূপে ৫০ জন উচ্চবংশীয়া মহিলা সঙ্গে ছিলেন। মহারাণী সেই উপাসনার বেদীর নিকট অগ্রসর হইলে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার কলেজের ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সকলে একত্র জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। তুর্কস্থানের রাজদূতের সেই দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর কেমন তন্দ্রালস আসিয়াছিল, সহসা সেই বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীত ধ্বনিতে চমকিত হইয়া চাহিয়া, সবিস্ময়ে সম্মুখের দৃশ্যকে ইন্দ্রজাল বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইল।

জাতীয় সঙ্গীত সমাপ্ত হইবার পর নবীনা মহারাণী জানু পাতিয়া বসিয়া স্বয়ং নীরবে করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন। তাহার পর ক্যাণ্টারবেরির আর্চ্চবিসপ প্রার্থনা করিলেন ও সভাস্থ সকল সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ইনিই আমাদের ইংলণ্ডের সাম্রাজ্ঞী।" তাহার পর লণ্ডনের বিসপ প্রার্থনা করিলেন ও মহারাণী উপযুক্ত শপথানুসারে ইংলণ্ডের ভার গ্রহণপূর্ব্বক, রাজ্যশাসন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তাহার পর চারিজন গার্টার নাইট্‌স মহারাণীর মস্তকোপরি সুবর্ণখচিত বস্ত্র আচ্ছাদন করিলে, আর্চ্চ বিসপ সেই সুবর্ণপাত্র হইতে পবিত্র তৈল লইয়া সাম্রাজ্ঞীর সুকুমার করদ্বয়ে ও মস্তকে সিঞ্চিত করিলেন। পরে মহারাণীর হস্তে রাজ-অঙ্গুরীয় পরাইয়া এক হস্তে মহামূল্য গোলক ও অন্য হস্তে রাজদণ্ড প্রদত্ত হইল। অমনি সকলে চতুর্দ্দিক হইতে একত্রে বলিয়া উঠিলেন "জগদীশ্বর সাম্রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" ("God save the Queen")। যত উচ্চপদস্থ রাজ-সভাসদ ও কর্ম্মচারী এবং মাননীয়া লেডি সকল আপন আপন মস্তকের মুকুট উত্তোলন করিয়া রাজসম্মান প্রদর্শন করিলেন। সে দৃশ্য অভূতপূর্ব্ব! চতুর্দ্দিকের হীরা ও মাণিক্যের উজ্জ্বল প্রভায় সূর্য্যের কিরণ ম্লান হইয়া গেল, ও কক্ষমধ্যে সহস্র সূর্য্যের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল! সেই মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিকে বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সেণ্ট জেম্‌স পার্ক ও টাওয়ারে ঘন ঘন কামানের মাঙ্গলিক ধ্বনি হইতে লাগিল।

রাজমুকুট শিরে পরিধান করিয়া মহারাণী রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে আর্চ্চ বিশপ তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া সাম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত রাজসম্মান প্রদর্শন করিলেন। তাহার পর সাম্রাজ্ঞীর আত্মীয় ডিউক অফ সসেক্স ও কেম্ব্রিজ সাম্রাজ্ঞীর মুকুট স্পর্শ করিয়া তাঁহার বাম গণ্ডে চুম্বন করতঃ বিদায় লইলেন।

তাহার পর সকল পিয়ার্সেরা, সতর জন ডিউক, ছাবিংশতি জন মার্কুইস, চুরানব্বই জন আয়ল্স, বিংশতি জন ভাইকাউণ্ট, বিরানব্বই জন ব্যারন্‌, পরে পরে মহারাণীর সম্মুখে আসিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া, মুকুট স্পর্শ করিয়া, তাঁহার কর চুম্বনপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। তন্মধ্যে একজন পিয়ার্সের নাম উল্লেখযোগ্য। অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ লর্ড রোলো অন্য দুইজন পিয়ার্সের হস্ত ধরিয়া সেই সিঁড়ি বাহিয়া উপরে মহারাণীর নিকট অগ্রসর হইয়া আসিতে, সহসা সঙ্গীদ্বয়ের হস্ত-স্খলিত হইয়া একেবারে গড়াইতে গড়াইতে সিঁড়ির তলে পড়িয়া যান। তাঁহাকে সে সময় একটি স্তূপীকৃত বস্ত্রের বোঝার মত দেখাইতেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সঙ্গীদ্বয়ের সাহায্যে পুনরায় ভূমিতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সিঁড়িতে উঠিয়া মহারাণীর সিংহাসনের নিকট অগ্রসর হইলেন। মহারাণী তাঁহাকে অসমর্থ দেখিয়া, ব্যথিত হইয়া লর্ড মেলবোরনের পরামর্শানুসারে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া লর্ড রোলোকে অভিবাদন করিলেন, এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক মস্তক নত করিয়া হেলাইয়া দিলে বৃদ্ধ লর্ড মুকুট স্পর্শ করিয়াই, হর্ষান্বিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

যথারীতি সকল অনুষ্ঠান সমাধার পর নবীনা সাম্রাজ্ঞী চারি ঘটিকার সময় আবি ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন। প্রায় সার্দ্ধ ৫ ঘটিকা তিনি সেই স্থানে সাম্রাজ্ঞীর বেশে ছিলেন। তিনি সেই প্রথম রাজমুকুট পরিধান করিয়া রাজদণ্ড হস্তে যখন রাজপথে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার সেই হর্ষোন্মত্ত ভক্ত প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে সেই সাম্রাজ্ঞী-বেশে দেখিয়া আনন্দ-পুলকে জয়ধ্বনি করিল।

টমাস কার্লাইল লিখিয়াছেন "আহা বেচারী মহারাণী! এত অল্প বয়সে বালিকারা আপনার মস্তকের টুপিই পছন্দ করিতে পারে না, তাঁহাকে এত বড় সাম্রাজ্যের বোঝা বহিতে হইবে। স্বর্গের পরীরাও হয়ত এ কাজে ভয় পায়।"

রাজ-চিত্রকর লেসলি সেই রাজ্যাভিষেকের চিত্র লইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "মহারাণীর একটি প্রিয় ক্ষুদ্র স্প্যানিয়াল কুকুর ছিল। তিনি কখন তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া গেলে সে পথ চাহিয়া থাকিত। রাজ্যাভিষেকের দিনও সে পথ চাহিয়া দুয়ারে বসিয়াছিল, মহারাণী তাহাকে দেখিতে পান নাই। রাজকীয় অশ্বযান হইতে সত্বর অবতরণ করিয়া প্রায় ছুটিয়াই বেশবিন্যাসের কক্ষে গিয়া, সাজসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, হস্তের রাজদণ্ড ও গোলক রাখিয়া, ও মস্তকের মুকুট খুলিয়া, তাহার নিকট গিয়া তাহাকে সাদরে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন "এই যে আমার ড্যাস। এখনো তোমার স্নান হয়নি, এস আমি স্নান করিয়ে আনি।"

সেই রাত্রিতে তাঁহার রাত্রিভোজনের সময় নানা দেশীয় প্রায় একশত ব্যক্তি

নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সেদিন প্রায় সমস্ত নগরে ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। ওয়ার্ক হাউসে, হাঁসপাতালে দাতব্য স্কুলে পরম যত্নে আহার করান হইয়াছিল। সমস্ত নগর উজ্জ্বল দীপাবলীতে ও সুরভিত কুসুম পল্লবে সুসজ্জিত হইয়াছিল। লণ্ডনের সকল প্রমোদালয়ে (থিয়েটারে) বিনা টিকিটে যাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। পার্কে নানা প্রকার আতস বাজীর তামাসা দেখান হইতেছিল। হাইড পার্কে চারি দিবস ধরিয়া ফ্যানসি বাজার বসিয়াছিল। সমস্ত সহর যেন নব জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। নগরবাসীরা অসীম আনন্দ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সাধারণ শ্রেণী হইতে রাজ্যাভিষেকে ৬৯,০০০ পাউণ্ড চাঁদা উঠিয়াছিল।

রাজ্যাভিষেকের কয়েক মাস পরে রাজ-চিত্রকর লেসলি সেই রাজ্যাভিষেকের পরিচ্ছদে মহারাণীর তৈলচিত্র লইয়াছিলেন। মহারাণী অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার জন্য বসিয়াছিলেন, এবং পরে মূল্য দিয়া স্বয়ং সেই চিত্র ক্রয় করিয়াছিলেন।

রাজ্যাভিষেকের দিনে সাউথ ডিভনে সৈনিক কর্ম্মচারী ও মৎস্যজীবীরা একটি ক্ষুদ্র সভা আহ্বান করিয়াছিল। সেই গ্রামের ধর্ম্মযাজক মহারাণীর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একটি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ও সেই বিষয়ে নিম্নলিখিত গীতটি লিখিয়া সকলে একত্রে গাইয়াছিলেন:—

জগদীশ! তব দয়া আশীর্ব্বাদ রাশি
বরিষ রাণীর শিরে, যেন দিবানিশি
থাকে তাহা ঘিরিয়া তাঁহারে।
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা শিখাও তাঁহায়,
রক্ষ অমঙ্গল হতে, মঙ্গল ছায়ায়
রক্ষি-সম রেখো তাঁরে, নিশায় দিবায়,
তব দয়া যেন সদা ঝরে।
জ্ঞানী ধীর কর তাঁরে, প্রভু দয়াময়,
হউক সাধুতাপূর্ণ সে হৃদি নিলয়,
আশীষি, লভি আশীর্ব্বাদ।
রাজ্য তাঁর হয় যেন শুধু ধর্ম্মময়,
সকলে বলিবে 'যথা ধর্ম্ম তথা জয়',
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যেশ্বরী হউন ধরায়,
পূরায়ে সবার মন-সাধ।
যেন ভক্ত প্রজাগণ মা বলিয়া ডাকে,
মার স্নেহ সুধা সদা সে হৃদয়ে থাকে,
হাস্যমুখে করুন্ কল্যাণ।
সত্য ধর্ম্ম প্রচারিত হোক তাঁর নামে,
পাপ, মিথ্যা, অবিশ্বাস সব যাক্ থেমে,
শান্তি, মুক্তি, স্বাধীনতা আনন্দ আরামে
ঘিরে থাক বাড়াইয়া মান।
তোমারি মঙ্গল অই আশীষ ছায়ায়,
রাজ-রাজেশ্বর! তাঁরে রেখো করুণায়,
শুন সদা প্রার্থনা তাঁহার।
এই মর ধরা ছাড়ি একদিন যবে
তোমাতে তাঁহার আত্মা মিলিত হইবে,
আনন্দে আলোক-ধারা হৃদয়ে মিশাবে,
যেন তোমা পান অনিবার।

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত)।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কালি ও কলম।

কালি ও কলমের কবে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কেহ বলিয়া দিতে পারে না। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র এবং গ্রহ উপগ্রহাদির সৃষ্টির কথা বাইবেলে পাওয়া যায়, সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃতের উদ্ভবের কথা হিন্দুর পুরাণে পড়া যায় এবং ভূত প্রেতের উৎপত্তির কথা কোরাণে দেখা যায়, কিন্তু —কালি ও কলমের সৃষ্টির কথা কোথাও পাওয়া যায় না! কালি ও কলম লইয়া যাঁহারা সমস্ত জীবন স্বদেশীয় সাহিত্যের সেবা করিতে করিতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও কালি কলমের ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। অনুসন্ধানে আমরা এই প্রাচীন দম্পতীর—কালি ও কলমের কিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই এখানে উল্লেখ করিব।

অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, নারী জাতিই কালি ও কলম এতদুভয়ের আবিষ্কর্ত্রী। বিলাতে প্রতি বৎসর "Hyde Park Demonstration" হাইড উদ্যানোৎসব নামে এক মহোৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবে বহুলোকের সমাগম হয় এবং নানা বিষয়ের বক্তৃতা, আলোচনা, তামাসা প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইং ১৮৬৮ অব্দে জন্ নটীংহাম নামক বিখ্যাত ভূ-পরিব্রাজক (An English Globe-trotter) কালি ও কলম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন এবং ঐ বক্তৃতায় বহু প্রকার কলমের ও কালির নমুনা দেখান। ঐ বৎসরের বিশ্বব্যাপী টাইমস্ পত্রে নটীংহাম সাহেবের বক্তৃতার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অনুবাদ করিয়া দিতেছি। বহুদর্শী নটীংহাম সাহেব বলিয়াছেন "ইথিওপিয়া দেশের এক রমণী সর্ব্বপ্রথমে মসীর আবিষ্কার করেন, তাঁহারই কনিষ্ঠা ভগ্নী লেখনীর আবিষ্কর্ত্রী। গ্রীশ দেশে কনিষ্ঠার বিবাহ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা ভগিনী কুব্জপৃষ্ঠ এবং স্থূলদেহ ছিল, সুতরাং আকৃতি অতি জঘন্য বলিয়াই তাহার বিবাহ হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। লোকে তাহাকে "বাঁকা," "অসরল," "ক্রূর," প্রভৃতি নামে অভিহিত করিত। কনিষ্ঠা ভগিনী দেখিতে সুন্দরী, সরল-প্রকৃতিক এবং সরল-দেহ। ঐ স্ত্রীলোকদ্বয়ের আর কোনও বিশেষ পরিচয় সাহেবের বক্তৃতায় পাওয়া যায় না। নটীংহাম আরও লিখিয়াছেন "হরীতকী (Mirabolis) হইতে সর্ব্ব প্রথমে কালির সৃষ্টি।" এ কথার কোনও যুক্তি বা প্রমাণ দিতে সাহেব বাহাদুর সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তদনন্তর তিনি লিখিতেছেন "ঐ সময়ে ভেলো উজার নামক রাজা ইথিওপিয়া দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সভায় বহু-

সংখ্যক পণ্ডিতের সমাগম হইত। রাজা নিজেও বিদ্যোৎসাহী, সবক্তা এবং বহুদর্শী ছিলেন। দুইটি ভগ্নী কালি ও কলম লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা এবং অমাত্যগণ তাঁহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! সরলে ও ক্রূরে, সৌন্দর্য্যে ও কদর্য্যে কেমন মিলিয়াছে দেখ দেখি? এমন আশ্চর্য্য মিলন কেমনে সম্ভবে?" রাজার কথা শুনিয়া জ্যেষ্ঠা বলিয়া উঠিল, "মহারাজ! আপনি সরলে ও ক্রূরে মিলিতে দেখেন নাই, কিন্তু আমরা তাহা দেখিয়াছি। তীর ও ধনু একত্র দেখিয়াছেনত? বলুন দেখি, তীর কেমন সরল এবং ধনু কেমন বক্র!" এমন সুন্দর উত্তর প্রাপ্ত হইয়া রাজা লজ্জায় অধোবদন হইলেন এবং স্ত্রীলোকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। রমণী বলিলেন "প্রভো! যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের দুই ভগ্নীর আবিষ্কৃত কালি ও কলম যাহাতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহাই আদেশ করুন।" রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। নটিংহাম সাহেবের মতে সেই অবধি প্রকৃত কালি ও কলমের সৃষ্টি।

নটিংহাম সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় কলম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মসী সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য অতি অল্পই ছিল। বহুদর্শী সাহেব বাহাদুর প্রায় ৬৭ প্রকার লেখনীর নমুনা দেখাইয়াছিলেন। চিত্র না হইলে সে সকল কলমের নমুনা বুঝাইতে পারিব না, সুতরাং কলম সম্বন্ধে আমরা অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। কালি ও কলম না থাকিলে সরস্বতীর রাজত্ব থাকে না, আবার সরস্বতীই বিদ্যা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং স্ত্রীলোক, সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য মাসিক পত্রিকায় কালি কলমের কথা যেমন শোভা পায়, অন্যত্র তেমন শোভা পায় না।

কালি সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিতেছি, তাহা আমাদের নিজের অনুসন্ধান ও বহুদর্শনের ফল। আমরা ৫৩ প্রকার মসীর আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই সকল মসী কোনও না কোনও সময়ে লিখন কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে; ইহাদের মধ্যে কতকগুলির ব্যবহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং কতকগুলির ব্যবহার এখনও চলিত আছে। প্রাচীন কালের সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদিগের মধ্যে নানা প্রকারের মসী প্রচলিত ছিল। এই সকল মসীর বিবরণ সংগ্রহ দ্বারা সাহিত্য জগতের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সহায়তা হইলেও হইতে পারে। নিম্নে প্রাচীন ও প্রচলিত অনেক প্রকার মসীর নাম দেখিতে পাইবেন।

মসীর তালিকা।

(১ম) 'নেহদা'; নীলনদের তটস্থ শুভ্রবৎ মৃত্তিকাকে প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক

করিয়া চূর্ণ করতঃ লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিলে নেহদা প্রস্তুত হয়। ইহা আফ্রিকায় প্রচলিত ছিল। (২) 'বরিয়া'; সিংহল দশের ম্যাংগোষ্টীন গাছের পাতার রস একটু যবক্ষার সহ মিলাইলে বরিয়া প্রস্তুত হয়। (৩) 'সর্ব্বরি'; রাজপুতানার লালমাটি বিশেষ, মৌয়া ফলের সঙ্গে ভিজাইয়া তৈয়ার করিতে হয়। (৪) 'ভোলাউ'; রট্‌লাম, আগর, উজ্জয়িনী প্রভৃতি অনেক প্রদেশে ভেলার, (ভল্লাতক বা Marking Nuts) কাথে ইহা প্রস্তুত হয়। (৫) 'বৃন্দাবনী'; বৃন্দাবনের এক প্রকার মাটির চূর্ণ সহ কাঁজি মিশাইলে ইহা প্রস্তুত হয়। (৬) 'গোপীয়া'; বৃন্দাবনের গোপীমাটি নামক সুগন্ধিযুক্ত শ্বেতবর্ণের মৃত্তিকায় ও দেশীয় গোপী চন্দন নামে সুগন্ধিযুক্ত শ্বেত চন্দন বাটার সহিত উষ্ণ জল মিশাইলে ইহা প্রস্তুত হয়। এই কালি মহান্ত, গোস্বামী এবং রাজারা ভাগবত লিখিতে ব্যবহার করেন। গোপীচন্দন এবং গোপীমাটি বাজারে সচরাচর বিক্রয় হয়। গোঁসাই, বৈষ্ণব ও মোহান্তদিগের তিলক ও ফোঁটার জন্য ইহা নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (৭) 'হলুদীয়া'; কেবলমাত্র সাধারণ হরিদ্রা (কখনও বা দারুহরিদ্রা) বাটিয়া জলে গুলিয়া দিলে হলুদ বর্ণের যে তরল পদার্থ হয়, তাহারই নাম হলুদীয়া। বিবাহের পত্রে ইহা ব্যবহৃত হয়। (৮) "লাক্‌তী"; অলক্ত (আলতা) জলে ভিজাইলেই ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ, বোম্বে এবং বাঙ্গালার অনেক স্থলে, বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পত্রে এই কালির ব্যবহার হইয়া থাকে। (৯) 'সোবিস্কী' (Sobiskii); পোলাণ্ডের সোবিস্ক ভাষার বর্ণমালা লিখিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। বর্ণিচ্‌ নামক বৃক্ষের ইহা নির্য্যাস। (১০) 'মিরাজিম্‌'; আফ্রিকার হাইরোগ্লিফ্‌ চিত্রিত করিতে ইহা ব্যবহৃত হইত। ইহাও বৃক্ষ বিশেষের নির্য্যাস। (১১) 'সেয়াবৎ'; মেশোপাটেমিয়ার কিউফা নগরে সর্ব্বপ্রথমে যে কালিতে কোরাণ লিখিত হইয়াছিল, তাহাই সেয়াবৎ; ইহা কতকগুলি বৃক্ষের বল্কলের সংমিশ্রিত ক্বাথ। (১২) "যুলীশা"; ইহা প্রাচীন পার্শীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উষ্ট্র মূত্রের সহিত লৌহ চূর্ণ মিশাইয়া অনেক্ষণ অগ্নিতে গরম করিলে ইহা প্রস্তুত হয়। (১৩) 'ভিণ্ডি'; ভিণ্ডি নামক পার্ব্বতীয় লতার ইহা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রস। (১৪) ভৃঙ্গরাজের ক্বাথে মণ্ডুর চূর্ণ মিলাইয়া এক প্রকার মসী প্রস্তুত হইত, তাহার কোনও বিশেষ নাম পাওয়া যায় নাই, পঞ্জাবের স্থানে স্থানে ইহা "ভীমরাজী" বলিয়া পরিচিত। (১৫) 'পূতিকা' (পুঁই) শাকের 'মিচুড়ি' বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত বর্ণের ফলের রসে এক প্রকার কালি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশুর অন্নপ্রাশন, উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্রে ও সরস্বতী দেবীর কাপড় ছোপাইতে পল্লীগ্রামে এখনও এই কালি ব্যবহৃত হয়। (১৬) ত্রিফলী; হরীতকী, বহেড়া এবং আমলা (যাহাকে

বৈদ্যেরা ত্রিফলা বলিয়া থাকেন) এই কয়েকটি দ্রব্যের কাথে এক অতি সুন্দর কালি প্রস্তুত হয়। হিন্দীতে ইহার নাম ত্রিফলা, বাঙ্গালায় ইহার নাম কষকালি। (১৭) অতি পুরাতন, মলিন এবং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণের কম্বলকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া তাহার ভস্মে সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ও উষ্ণ জল মিশাইয়া এক প্রকার উত্তম কালি প্রস্তুত হয়, ইহা কাটিয়াবাড় প্রদেশে প্রচলিত। (১৮) রসাঞ্জন চূর্ণ এবং নিশিন্দা পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে রাখিলে যে মসী প্রস্তুত হয়, তাহা এখনও মহীশূর প্রদেশে প্রচলিত আছে। (১৯) বড় বড় শুষ্ক রুদ্রাক্ষ অনেকক্ষণ জলে সিদ্ধ করিয়া যে কাথ পাওয়া যায়, তাহার সহিত হরিতাল-ভস্ম, স্বর্ণভস্ম, রৌপ্যভস্ম এবং পারদভস্ম মিলাইয়া পুনরায় মৃদু জ্বালে পাক করিতে হয়। পাক শেষ হইলে উহাতে দ্রাক্ষারস মিলাইলে অতি উদ্দীপ্ত সুবর্ণের ন্যায় কালি হয়, ইহা অতীব মূল্যবান্। বড় বড় রাজারা এখনও বেদ বা বেদান্ত নকল করিবার সময় ইহার ব্যবহার করেন। (২০) দশমূলের কাথে শিলাজতু শোধিত হইলে যে সুন্দর কালি হয়, তাহা মাড়োয়ার, নেপাল প্রভৃতি দেশে এখনও প্রচলিত আছে। (২১) বকম্ বৃক্ষের বন্ধলের কাথে সুন্দর কালি হয়। কাটোয়ার সুপ্রসিদ্ধ কেশব ভারতীর পুস্তকালয়ে এই কালী ব্যবহৃত হইত। কেশব ভারতী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের দীক্ষাগুরু ছিলেন। (২২) "করিয়াদ্"; এই গাছের পাতার রসে মেদিনীপুরের প্রাচীন লেখকেরা গ্রন্থ লিখিতেন। পাঁশ-কুড়া গ্রামে ঐ গাছ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পত্রগুলি গাভীর রোগ বিশেষে ব্যবহৃত হয়। (২৩) জয়দেবের লেখনী হইতে সর্ব্বপ্রথম যে 'গীত গোবিন্দ' প্রস্তুত হয়, তাহার কালী অদ্ভুত! তুলসীপত্র, কদম্বপত্র, পদ্মপত্র, বিল্বপত্র এবং জবা কুসুমের রস একত্র মিশাইয়া গন্ধকসিদ্ধ জলে পাক করতঃ রৌদ্রে রাখিতে হইত, তদনন্তর দুই এক বিন্দু কনাদ-নির্যাস মিশ্রিত করিলে ঘোর লালবর্ণের এবং অতি সুগন্ধি মসী প্রস্তুত হইত। (২৪) হেনা ফুলের রসে মুসল-মানদের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ লেখা আছে। (২৬) চাউলকে ভাজিয়া লইয়া তাহা জলে ভিজাইতে হয়, পরে উহাতে ভূষো মিশাইলে "ঝিয়ানি" কালি প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের দেশীয় জমীদারী কাছারী সমূহে এখনও প্রচুর পরিমাণে এই কালির ব্যবহার। (২৭) য়িহুদীদের পুরাতন টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথমে মেষচর্ম্মে "জাব্‌তুনী" মসীতে লিখিত হইয়াছিল। Olive oil অর্থাৎ জৈতুনের তৈলে শুষ্কবংশভস্ম মিলাইয়া ইহা প্রস্তুত হইত। (২৮) "তেলকালি"; প্রজ্বলিত লণ্ঠনে যে কালি পড়ে, তাহার সহিত তিল তৈল মিলাইয়া ইহা তৈয়ারি হয়। গুজরাটের অনেক গ্রন্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। (২৯) মালাবার উপকূলের "হীরলু"

নামক আত্রবৎ ফল বিশেষের কাথে ইহা প্রস্তুত হয়। ঐ ফল দেখিতে আমের মত, কিন্তু ভয়ানক বিষাক্ত। আমরা ঐ ফলের অনেক গাছ কোচিনে দেখিয়াছি। (৩০) "রমাই"; সিংহলের বুদ্দী নামক প্রাচীন হিন্দু জাতি এক প্রকার রমু নামক ফুলের রসে ইহা প্রস্তুত করে। সিংহলে অতি পুরাকাল হইতে ইহা প্রচলিত। কাণ্ডী নগরীতে আমরা এই মসী এবং এই মসী-লিখিত গ্রন্থ দেখিয়াছি। রমু ফুলকে লঙ্কার দেশীয় খৃষ্টানেরা "Passion Flower" বলিয়া থাকে। এই ফুলের একটা গন্ধ আছে। খৃষ্টানেরা বলেন, যিশুখৃষ্টের Passion week সময়ে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি এই ফুলের আঘ্রাণ লইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। আমরা কলম্বো নগরে এই ফুল দেখিয়াছি, ইহা দেখিতে অতীব মনোহর এবং নয়নানন্দদায়ক। (৩১) ছোটনাগপুরের গ্রামবাসীদিগের মধ্যে 'ডানকুনী' নামক এক প্রকার শাকের রসে মসী প্রস্তুত হয়। ঐ শাককে বৈদ্যশাস্ত্রে থালকুড়ী, জ্যোতিষ্মতী ও চোরকাঁচ্‌কী বলিয়া থাকে। এই শাককে প্রথমে পচাইয়া লইতে হয়। এই কালি অনেক বর্ষ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং ইহা সুন্দর জ্যোতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। (৩২) পোলীশা; গ্রীক দেশের প্রধান প্রধান নগরের বড় বড় ধনবান্‌ ব্যক্তি ব্যতীত ইহা কেহ ব্যবহার করে না। ইহা অত্যন্ত মূল্যবান এবং ইহার প্রস্তুতি-প্রণালী আমরা জানিতে পারি নাই। গ্রীক ভাষায় পলিশ Polis শব্দের অর্থে নগর, এই জন্য এই কালির নাম পোলিশা।

এই প্রকারে নানা বর্ণের ও নানা উপকরণের মসী প্রস্তুত হইত। নানা প্রকার ধাতু দ্রব্য হইতে বহু মূল্যবান্‌ মসী প্রস্তুত করিবার কথাও শুনা গিয়াছে। সময় সময় গুপ্ত কালিরও প্রচলন ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন রোমক রমণীগণ মৃতা স্ত্রীলোকদিগের কেশ হইতে এক প্রকার অদ্ভুত কৌশলে সুন্দর কালী প্রস্তুত করিতেন, ঐতিহাসিকেরা তাহাও লিখিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী

গর্ভস্থ মেয়েকে কি ছেলে করা যায়?

কত নারী ক্রমাগত মেয়ে প্রসব করিতেছেন, একটী পুত্রসন্তানের মুখ-দর্শন নাই। কে পৈতৃক ধনসম্পত্তি ও গুণ-গৌরবের উত্তরাধিকারী হইয়া বংশ রক্ষা করিবে? প্রসূতি নিজে লজ্জিত ও দুঃখে ম্রিয়মাণ। জন্মদাতা পিতার কত সঙ্কোচ ও ভাবনা! আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এ জন্য বিষন্ন! কন্যার পরিবর্ত্তে এবার একটী

পুত্র-সন্তান যদি হয়, তার জন্য কত মানত—কত আকিঞ্চন! হিন্দুদিগের মধ্যে পুত্রেষ্টি ও অন্য প্রকার যাগ যজ্ঞের জন্য কত ব্যয় ব্যসন হইয়া থাকে। অপরাপর জাতির মধ্যেও এ জন্য যথাজ্ঞান যথাশক্তি অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় না। তথাপি আবার কন্যা—আবার কন্যা, পুত্র আর হয় না। কন্যা ভারাক্রান্ত ও পুত্রপ্রার্থী পিতা মাতারা শুনিয়া আশ্বস্ত হউন্ চিকাগোর ডাক্তার কাডওয়েল বলিতেছেন, "আমার ব্যবস্থা মতে চলিলে গর্ভিণী মাতা পুত্রবতী হইবেন, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আমার ব্যবস্থা ব্যর্থ হইলে আমি সে জন্য দায়ী।"

কয়েক বৎসর হইল অষ্ট্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সেঙ্ক তাঁহার এক অদ্ভুত মত প্রচারিত করিয়া ইউরোপীয় চিকিৎসক মণ্ডলীকে ভীত ও চমকিত করেন। তাঁহার মতে কন্যা বা পুত্রের জন্ম জননীর শরীরের রাসায়নিক উপাদানের অল্পতা বা আধিক্যের উপরে নির্ভর করে। নৈত্রজন (Nitrogen) বা যবক্ষারজন-প্রধান খাদ্য গ্রহণে পুত্র, তদভাবে কন্যা জন্মিবার সম্ভাবনা। সেঙ্ক যে সে হাতুড়ে ডাক্তার নন। অনেক বৎসর চিকিৎসা করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ। ইনি অনেক বৎসর ধরিয়া "সন্তানোৎপাদন" বিষয়টী তাঁহার বিশেষ আলোচ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করেন। তিনি সাধারণ বিজ্ঞাপন প্রচারকদিগের ন্যায় অর্থোপার্জ্জনের জন্য তাঁহার মত প্রচারিত করেন নাই। বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ও লোকহিতার্থ বিয়েনার চিকিৎসক সমিতির বিবেচনার্থ তাঁহার মত তথায় জ্ঞাপন করেন।

চিকিৎসক সম্প্রদায় বড় রক্ষণশীল। কেহ কোনও নূতন মত আবিষ্কার করিয়াছে শুনিলে অনেক সময় তাহা তাঁহাদের অসহ্য ও অগ্রাহ্য। বর্ত্তমান হোমিওপ্যাথী প্রভৃতির ত কথাই নাই, সুবিখ্যাত হার্ব্বি যখন রক্ত-সঞ্চালনের প্রণালী আবিষ্কার করিয়া প্রচার করেন এবং গোমসূর্য্যাধান অর্থাৎ গোবীজে টীকা দিলে বসন্ত হয় না, এই মত যখন প্রথম প্রচারিত হয়, পদস্থ ডাক্তারেরা তখন ঘোর প্রতিবাদী হইয়া নূতন মত-পোষকদিগকে নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হন। সেঙ্কের উপরে ডাক্তারী পত্রিকা সকলে ঘোরতর আক্রমণ ও গালি বর্ষণ হয়। রাজবংশ সচরাচর নির্ব্বংশ হয়। ইউরোপের অনেক রাজবংশ ডাক্তারদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়া সেঙ্কের মত পরীক্ষা করিতে উৎসুক হন। তাঁহারা সেঙ্কের সাহায্য গ্রহণ করিয়া গর্ভিণী রাণী ও রাজবধূদিগকে যথা নিয়মে রাখেন এবং তাহাতে ফলোদয় দেখিতে পান। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সম্ভ্রান্ত পরিবারেরাও সেঙ্কের মতানুসরণে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে ডাক্তার সম্প্রদায় এমত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠেন যে, তাঁহারা সমবেত হইয়া সেঙ্কের নিকট এক নির্দ্ধারণ পাঠান যে হয় তিনি তাঁহার মত প্রত্যাহার করুন, নতুবা ব্যবসায় (profession) হইতে বর্জ্জিত

হইবেন। সেঙ্ক গালিলিওর অপেক্ষা সাহসী, তিনি আপনার মতে অটল এবং কিছুতেই সে মতের প্রত্যাহার করিলেন না।

ইহার পর অনেক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু হন এবং সেঙ্কের মত অবহিতচিত্তে আলোচনা করেন। ইহাঁদের মধ্যে চিকাগোর কোলম্যান কাডওয়েল একজন। সেঙ্ক তাঁহার প্রণালী অবলম্বনে পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনামাত্র বলিয়াছিলেন, ইনি বলেন "ঠিক্ আমার ব্যবস্থানুসারে চলিলে পুত্র সন্তান হইবেই হইবে, তাহার জন্য আমি (guarantee) জামিন।"

ডাক্তার কাডওয়েলের মত—মনুষ্য-দেহ (Cell) কোষ হইতে উৎপন্ন। গর্ভাধান কালে বীজকোষে লিঙ্গভেদ থাকে না। নিম্নতম শ্রেণীর জীবের (protoplasm) আর মানবের বীজে প্রভেদ লক্ষিত হয় না। গর্ভের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদিম (Cell) কোষের চারিদিকে কোষসংখ্যা বাড়িতে থাকে, সবই আদিম কোষ হইতে বহির্গত। কোষ সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে মানব-ভ্রূণ নিম্নতম জীব হইতে ক্রমেই উচ্চতর সকল জীবাকার ধারণ পূর্ব্বক অবশেষে মানবাকার প্রাপ্ত হয়। মানব ভ্রূণ প্রথমাবস্থায় মেরুদণ্ডী হয় না, অমেরুদণ্ডী (invertebrata) থাকে। অমেরুদণ্ডীদিগের পরীক্ষায় জানা গিয়াছে খাদ্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভ্রূণের লিঙ্গভেদ হয়। ডাক্তার সেঙ্ক বলেন যে তিনি মৌমাছি, পিপীলিকা, মৎস্য ও ভেক পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মধ্যে ইচ্ছানুসারে এরূপ পরিবর্ত্তন আনয়নে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছেন। যে ঝাঁকে পুং ও স্ত্রী সংখ্যা সমান হইত, বিশেষ খাদ্যযোগে তাহাদের পুংসংখ্যা শতকরা ৯০ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ডাক্তার কাডওয়েলের মতে গর্ভের প্রথম দুই মাসে অমেরুদণ্ডীর ন্যায় মানব-ভ্রূণও খাদ্যের অধীন। তৃতীয় মাসে পুং বা স্ত্রী লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তখন লিঙ্গ পরিবর্ত্তন করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু একটী কথা মনে রাখা উচিত, সকল গর্ভিণীর পক্ষে এক নিয়ম নয়। বস্তুতঃ প্রত্যেকরই প্রকৃতির বিশেষত্ব আছে এবং তদনুসারে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ডাক্তার কাডওয়েল যেমন চিকিৎসক, তেমনি যন্ত্রোদ্ভাবক। তিনি চিনি ও নৈত্রজন উৎপাদনের যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাদ্বারা পরিমাণ ঠিক্ করিয়া বিশেষ বিশেষ গর্ভিণীর জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা দেন।

কাডওয়েলের চিকিৎসায় খাদ্য ও ঔষধ উভয় সেবনের বিধি। ঔষধ গাছ গাছড়া-প্রধান। তিনি বলেন "কোনও স্ত্রীলোক গর্ভের প্রথম দুইমাসের মধ্যে আমার চিকিৎসাধীন হইলে তিনি ছেলে মেয়ে যা চান তাহাই পাইবেন, এজন্য আমি দায়ী হইতে পারি।" তিনি আরও বলেন "আমি এ যুগের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার করিয়াছি, চিকিৎসকেরা ইহা যেন স্বীকার করেন এবং ইহাদ্বারা উপকৃত হন।"

* From Behar Times.

ধ্যান।

(নারদ)।

বীণাতন্ত্রীঃক্বণিতমিলিতৈস্তারকব্রহ্মগীতৈঃ
সদ্যোভিন্দন্নশনিকঠিনং দ্রাবয়ন্ দারুশৈলান্।
আর্দ্রীকুর্ব্বন্নিব দশ দিশঃ সান্দ্রপীযূষবর্ষৈঃ
প্রেমানন্দং মধুরমধুরং দৃষ্টিপাতৈঃ ক্ষরদ্ভিঃ ॥
শান্তজ্যোতির্জ্জিতশশধরো হেমযজ্ঞোপবীতী
বিশ্বপ্রেমাশ্রিত ইব তনুং নিত্যহাস্যোজ্জ্বলাস্যঃ।
বিভ্রৎ কৃষ্ণাজিনমথ জটাঃ পিঙ্গলা মেখলাং চ
ধ্যেয়ো দেবাসুরনরনুতো নারদো মুক্তযোগী ॥

পূর্ণসুধাকর-সম দেহের বরণ,
হেমময় ব্রহ্মসূত্র কণ্ঠে আভরণ ;
কটিতে মেখলা, কৃষ্ণাজিন পরিধান,
উজ্জ্বল পিঙ্গল জটা পৃষ্ঠে লম্বমান ;
হর্ষে পুলকিত তনু, সহাস্য বদন,
মূর্ত্তিমান্ বিশ্বপ্রেম, জীব-নিস্তারণ ;
প্রেমাবেশে দিব্য বীণা করিয়া বাদন,
তারক-ব্রহ্মের নাম করেন কীর্ত্তন ;
সে গীত-লহরী বীণা-ঝঙ্কারে মিশিয়া,
উঠিছে বৈকুণ্ঠলোকে বিশ্ব ভাসাইয়া ;
তরু, মরু, পাষাণ হইছে দ্রবময়,
বিদীর্ণ হইয়া যায় বজ্রের হৃদয় ;
প্রেমানন্দ কি মধুর দুনয়নে ঝরে !
সুধারসে দশদিক্ অভিষিক্ত করে।
সুরাসুর ত্রিসংসার যাঁর পূজা করে,
মুক্ত-যোগী সে নারদে ভাব ভক্তিভরে। (১)

(১) যাঁহার জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হওয়ায়, যিনি সশরীরেই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে 'মুক্তযোগী' বলে।

(প্রহ্লাদ)।

ব্যাপ্তং জ্বালাসহস্রৈরপি দিতিজগণৈঃ
ক্ষিপ্তমুচ্চণ্ডবহ্নৌ
পীযূষস্পর্শশীতৈরিব কমলদলৈর্বীজ্যমানং প্রফুল্লম্।
ধ্যায়ন্তং মুদ্রিতাক্ষং হরিপদকমলং কোটিকালাগ্নি-
শান্তিং
প্রহ্লাদং ধ্যায় বালং হরিময়হৃদয়ং ভক্তিপূর্ণাবতারম্॥

দানবপতির আজ্ঞা পেয়ে দৈত্যগণ (১)
বালক প্রহ্লাদে দৃঢ় করিয়া বন্ধন—
ফেলিল পর্ব্বতাকার জ্বলন্ত অনলে,
বেড়ি' তারে শত শত অগ্নিশিখা জ্বলে ;
তথাপি শিশুর তাহে নাহিক বিকার,
নাহি তাপ নাহি জ্বালা, প্রফুল্ল আকার ;
অমৃত-শীতল রক্তপদ্ম অগণন—
শিখারূপে যেন তারে করিছে বীজন ;
মুদি' আঁখি ভাবে হরি-চরণ-কমল,
কোটি কালানল যাহে হয় সুশীতল ;
হরিময় হৃদয়, হরিই যার প্রাণ,
হরি বিনা নাহি যার অন্য কিছু জ্ঞান ;
প্রেম-ভকতির সেই পূর্ণ অবতার—
প্রহ্লাদ শিশুর ধ্যান কর বারবার। (২)

(১) 'দানবপতি'—প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু।

(২) কথিত আছে, প্রহ্লাদের ভক্তিগুণে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তবৎসল হরি প্রহ্লাদের নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—"প্রহ্লাদ ! তুমি আমার নিকট অভিমত বর প্রার্থনা কর।" প্রহ্লাদ বলিলেন ;—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

(ধ্রুব)।

হিত্বা গেহং গহনবিপিনে বৃক্ষমূলে নিবণ্ণং
ত্যক্তাহারং হৃদি করপুটং শুন্য সম্মীলিতাক্ষম্।
হা গোবিন্দ প্রণতশরণ প্রাণবন্ধো কুতোসী-
ত্যাক্রোশন্তং সকরুণরবৈর্দ্রিয়ন্তং দবাগ্রীন্॥
সর্পব্যাঘ্রাদিভিরুপগতৈর্হিংসনায়াপি সদ্য-
স্তেজঃস্তৈর্বিবৃতবদনৈর্বীক্ষিতং বিস্ময়েন।
বালাদিত্যামলতনুরুচিং পঞ্চবর্ষং বিষক্তং
ধ্যায়েদ্ভক্ত্যা ধ্রুবমবিরলপ্রেমবাষ্পার্দ্রমূর্ত্তিম্॥

মাতা-পিতা, গৃহ, বন্ধু ছাড়িয়া সকলে—
গহন কাননে আসি' বসি' বৃক্ষতলে—
অনাহারে দুটী কর যুড়ি' বক্ষোপরি—
মুদ্রিত নয়নে ধ্রুব ডাকে—"কোথা হরি!
হে গোবিন্দ! প্রাণবন্ধু! প্রণত-আশ্রয়!
কোথা আছ! দীনে দয়া কর দয়াময়!"
এরূপে কাতর স্বরে করিছে আহ্বান,
বিদীর্ণ হ'তেছে তাহে অরণ্য পাষাণ;
অমল দেহের ভাতি অরুণ-প্রকাশ,
পঞ্চবরষের শিশু অঙ্গে নাহি বাস;
ভাসিছে কোমল দেহ প্রেমাশ্রু-ধারায়,
সোণার কমল যেন ভাসে বরষায়;
শার্দ্দুল, ভুজঙ্গ আদি আসি' হিংসা তরে—
হেরি' তারে রহে সবে স্তব্ধ-কলেবরে;
বিস্ময়ে নিস্পন্দ যত বন্য জন্তুগণ—
হাঁ করিয়া আছে তারে করিয়া বেষ্টন;
হরি-পদে সমাহিত, নাহি বাহ্য জ্ঞান,
ভক্তিভরে হেন শিশু করে সদা ধ্যান।

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥"

সন্নিপাত-বিকারের তৃষ্ণার মতন,
বিষয়ে যেরূপ তৃষ্ণা করে মূঢ়গণ;
সেইরূপ তৃষ্ণা মোর যেন দয়াময়!
হরি হে! তোমারি প্রতি চিরকাল রয়!
সহস্র সহস্র যোনি করিব ভ্রমণ,
হে নাথ! তাহাতে কষ্ট করিনা গণন;
কিন্তু হরি! যে যোনিতে পড়িব যখন'
তোমাতে একাগ্র ভাবে থাকে যেন মন;
অখিল বিশ্বের মূল তুমি ভগবান্,
তোমাতেই আত্মা যেই করে সমাধান;
হস্তেই তাহার মোক্ষ থাকে অনুক্ষণ,
ধর্ম্ম-অর্থ-কামে তার কিবা প্রয়োজন?

দৈহিক স্নেহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা।

আমরা পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে যে সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকি, তাহাদের প্রায় সকলগুলিতেই অল্লাধিক তৈলাংশ আছে। ছাগ, মেষ প্রভৃতি পশুর মাংস, কূর্ম্ম, কর্কট ও নানাবিধ মৎস্য ও পক্ষীর মাংস—আন্তব ভক্ষ্য দ্রব্য তৈলে পরিপূর্ণ। উদ্ভিজ্জ খাদ্যেও স্নেহাংশ অল্প নহে। এই সমস্ত ভক্ষিত তৈল রাসায়নিক প্রক্রিয়া যোগে দেহময় সঞ্চালিত হইয়া শরীরের চাক্‌চিক্য, মসৃণতা ও পুষ্টতা সাধন করিয়া থাকে। মৃত্তিকাতেও তৈলাংশ আছে, সুতরাং মৃত্তিকা মাখিয়াও শরীরের লাবণ্য প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত দৈহিক স্নেহ বা তৈল লোমকূপস্থ

ঘর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিকৃত হয় এবং দৈহিক তাপ ও বহির্বায়ুর সংযোগে বিশেষতঃ ধূলিকণা ও অন্যান্য মলাযোগে গাঢ় হইয়া থাকে। এই মলা বা ক্লেদ দুর্গন্ধ ও অপকারক। ইহা দ্বারা লোমকূপ আবদ্ধ হইলে শরীর মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয় এবং তন্নিবন্ধন কেবল চর্ম্মরোগ নহে, অধিও অনেক প্রকার উৎকট উৎকট পীড়াও হইয়া থাকে। শারীরিক এই অনিষ্টকর ক্লেদ বা মলা অপনয়ন ও লোমকূপ-দ্বার পরিষ্কার করাই স্নানের উদ্দেশ্য। অবগাহন স্নান তজ্জন্যই বিশেষ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অভাব পক্ষে তোলা জলে স্নানের নিয়মও আছে। আমরা প্রস্তাবান্তরে স্নানের বিষয় আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। সর্ব্বদা গাত্রমার্জ্জনী (গামছা বা টোয়ালে) দ্বারা শরীর পরিষ্কার করা সকলেরই আয়ত্তাধীন। স্নানের পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে তৈল মাখিবার ব্যবস্থা আছে। তিল ও সর্ষপ তৈলই মর্দ্দনের উপযোগী, কখন কখন নারিকেল ও অন্যান্য তৈলও ব্যবহৃত হয়। তিল তৈল স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট ও সর্ষপ তৈল মলাপহারক। এই জন্য ইহাদের ব্যবহার এত অধিক। বিশেষতঃ সর্ষপ তৈল দুর্গন্ধ নিবারণে বিশেষ সমর্থ। দৈহিক তৈলে এই সকল তৈল মিশ্রিত বা মর্দ্দিত হইলে দৈহিক তৈলের গাঢ়তা নষ্ট হইয়া তারল্য সম্পাদিত হয়, তৎপরে স্নান দ্বারা প্রক্ষালিত হইলে, দেহ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত হয় এবং লোমকূপ সকল বিধৌত হইয়া বায়ু সঞ্চালনের সৌকর্য্য সাধিত হয়। ইয়ুরোপ ও অন্যান্য শীত-প্রধান দেশে স্নানের পূর্ব্বে অথবা মার্জ্জনার্থ সাবান ব্যবহারের নিয়ম আছে। এই সকল দেশের লোকদিগের প্রধান খাদ্য জান্তব মাংস। মাংসাশী পশুর ন্যায় ইহাদিগের গাত্র হইতে বিষম দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদিগের দৈহিক স্নেহ নিরামিষভোজীদিগের অপেক্ষা অধিকতর হওয়া সম্ভব; নতুবা সাবানের ক্ষার যোগে তাহা একবারেই বিনষ্ট হইত। যাহারা মাংসাশী নয় অথবা আমাদিগের দেশের লোকদিগের পক্ষে সাবান * অপকারী। ইহার ক্ষারে দৈহিক তৈল বিনষ্ট হইয়া দেহের রুক্ষতা সম্পাদন করে এবং তন্নিবন্ধন নানা প্রকার চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হইয়া স্বাস্থ্যহানি হয়। বাস্তবিক সাবান ব্যবহারে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, কান্তি ও সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া শরীর কঠিন, উষ্ণ, শুষ্ক ও শোভাহীন হয় এবং দৈহিক স্নেহাভাবে অচিরে হতশ্রী হইয়া থাকে। অনেকের ভ্রম আছে যে, সাবান ব্যবহারে ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্ম রোগ সকল আরাম হয়। পরীক্ষায় তাহার বিপরীত ফল উপলব্ধি হইয়াছে। বরঞ্চ নারিকেল তৈল ব্যবহার দ্বারা আশু

* সাবান ব্যবহারাপেক্ষা রুক্ষ স্নান অধিকতর প্রশস্ত। রুক্ষস্নানে দৈহিক স্নেহ নষ্ট হয় না। তপস্বী, যতি দণ্ডী ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী সাধুগণ ত্রিসন্ধ্যা রুক্ষ স্নান করিলেও তাঁহাদের দেহকান্তি সর্ব্বদাই উজ্জ্বল ও সর্ব্বদাই প্রদীপ্ত।

উপকার পাওয়া গিয়াছে। একজন বিজ্ঞ ইংরাজ চিকিৎসক লিখিয়াছেন যে শীতল বা সময় বিশেষে উষ্ণজল সিক্ত গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা বিলক্ষণ রূপে গাত্র মার্জ্জনা করিলে শীঘ্রই ঘামাচি ও ব্রণাদি চর্ম্মরোগ আরাম হয়। স্নান ও মার্জ্জনান্তে শুষ্ক গাত্রমার্জ্জনী বা শুভ্র বস্ত্র দ্বারা শরীর ভাল করিয়া মুছিবে এবং যখনি ঘর্ম্ম নির্গত হইবে, তখনি তাহা মুছিয়া ফেলিবে। শীতল বায়ু সেবনে বা ব্যজনে ঘর্ম্ম শরীরে বসাইয়া লোমকূপ দ্বার বন্ধ ও দৈহিক তৈল বিকৃত করিবে না।

বর্ষাকালে বারাণসী।

কাশীর শোভা গঙ্গা,
গঙ্গার শোভা কাশী।

হিমাচলের তলদেশ ভেদ করিয়া দুইটী পূত ধারা নির্গত হইয়াছে। একটী গোমুখী-প্রসূত গঙ্গোত্রি হইয়া প্রবাহিত ও অপরটী গণেশ গঙ্গার কিয়দ্দূরে পবিত্র হ্রদ হইতে উৎপন্ন। প্রথমটীর নাম ভাগীরথী ও দ্বিতীয়টীর নাম অলকানন্দা। অলকানন্দা স্বর্গঙ্গা অর্থাৎ স্বর্গস্থ প্রবাহ এবং ব্রহ্মলোক হইতে রাজা ভগীরথ কর্ত্তৃক আনীত স্রোত ভাগীরথী বলিয়া পুরাণে উক্ত হইয়াছে। এই উভয় পূত প্রবাহ গাড়োবাল প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দেবপ্রয়াগে সম্মিলিত হইয়াছে। অলকানন্দা ভাগীরথী অপেক্ষা আয়তনে বৃহত্তর। স্বর্গঙ্গা বলিয়া ইহার মাহাত্ম্যও অল্প নহে; বিশেষতঃ ধৌলী, পিণ্ডার, মন্দাকিনী ও মান্দারের সহিত মিলিত হওয়াতে ইহার কলেবরও সমধিক পুষ্ট ও বৃহৎ হইয়াছে। ইহা যে স্থলে ধৌলীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাকে বিষ্ণুপ্রয়াগ কহে; সেইরূপ পিণ্ডারের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণ-প্রয়াগ, মান্দাকিনীর* সহিত মিলিত হইয়া নন্দপ্রয়াগ এবং মান্দারের সহিত মিলিত-হইয়া রুদ্রপ্রয়াগ হইয়াছে। দেবপ্রয়াগে উভয় স্রোত মিলিত হইয়া গঙ্গা নামে অভিহিত। গাড়োবাল প্রদেশস্থ এই পঞ্চ প্রয়াগই অতি পবিত্র। সিদ্ধ, চারণ, যতি ও ভাগ্যবান্ যাত্রিগণ এই সকল পূত প্রয়াগে স্নানার্চ্চনা করিয়া পাপমুক্ত হইয়া থাকেন। গঙ্গা দেবপ্রয়াগ হইতে প্রয়াগে (এলাহাবাদে) যমুনার সহিত মিলিত হইয়া প্রায় সহস্রাধিক মাইল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ছাপঘাটীর মোহানা দিয়া নবদ্বীপ ও কলিকাতা হইয়া গঙ্গাসাগরে পতিত হইয়াছে। অনেকের বিশেষতঃ য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে পদ্মাই মূল গঙ্গা, কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে; কারণ ছাপঘাটীর পর আর মাহাত্ম্য নাই,

* মন্দাকিনীও স্বর্গঙ্গা বলিয়া প্রকাশিত।

স্রোতোংশ পদ্মা বলিয়াই উক্ত আছে। বিশেষতঃ যে সকল দণ্ডী ও যতি গঙ্গা প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই স্থান দিয়াই গঙ্গাসাগরে গমন করেন। সাগরসঙ্গমে কপিলাশ্রমও অন্ততর প্রমাণ। শাস্ত্রকারেরাও প্রয়াগে ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা, যমুনা ও (কল্পিত), সরস্বতীর যুক্ত বেণী বন্ধন করিয়া ত্রিবেণীতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ত্রিবেণীর বাম ভিতে যমুনা (বাঘের খাল) দক্ষিণে সরস্বতী, মূল স্রোত ভাগীরথী অগ্রে প্রবাহিত। যাহা হউক দেবপ্রয়াগ হইতে হরিদ্বার বা হরদ্বার এবং হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় কূলে যত নগর ও নগরী প্রতিষ্ঠিত আছে, কাশীর ন্যায় এমন সুন্দর, মনোহারী ও পবিত্র নগর একটীও নাই। পত্তন ভূমির উচ্চতা, পূত পয়োবিধৌত অর্দ্ধেন্দুনিভ অবয়ব এবং অর্দ্ধযোজন-বিস্তৃত অবিরাম সোপানাবলী ইহার অনুপম ও প্রধান দৃশ্য। গগনস্পর্শী দেবমন্দির সকলের কনকপ্রভ কলস রাজী, তদুপরি উড্ডীয়মান বিচিত্র কেতনাবলী, সমুচ্চ মস্‌জিদ সকলের উন্নত চূড়ানিচয় এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠতল হর্ম্ম্যাবলীর অত্যুচ্চ শিখর দেশ যুগপৎ নয়ন ও মনের হর্ষ বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে! কাশী সমুদ্রের সমতল হইতে ২৫৩ পাদ উচ্চ এবং গঙ্গার সমতল হইতে ৩০ কোথাও ৪০ পাদ উচ্চ। ইহা একটী বিস্তৃত নগের সানুদেশ। চতুর্দ্দিকস্থ দেশসকল অপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া "কাশী ত্রিশূলের উপর প্রতিষ্ঠিত" প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। বরণা, অসী ও গঙ্গা দ্বারা বেষ্টিত থাকাতেও ইহা পৃথিবী হইতে ভিন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বরণা একটি সামান্য নদী, আলাহাবাদ প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া কাশীর পশ্চিম সীমা বেষ্টনপূর্ব্বক উত্তরে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইতেছে। সঙ্গম স্থলের কিছু দূরে ইহার উপর; একটী সাময়িক সেতু বা বাঁধ না থাকিলে বর্ষাভিন্ন অন্য সময়ে ইহাতে জল রক্ষা হইত না। নগরের দক্ষিণ সীমায় অসী। ইহা এক্ষণে একটী শুষ্ক স্রোত বা "নালা" মাত্র। বর্ষাকালে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইলে সঙ্গমের জল হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত কয়েক দিনের জন্য ইহার সত্তা অনুভূত হয়। তৎপরে ইহার গভীর খাদ বিবিধ শস্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন বরণা+অসী শব্দদ্বয় হইতে বারাণসী শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। তাহা হইলে বারাণসী না হইয়া বরণাসী হইত। প্রকৃত ব্যুৎপত্তি বার+অনস। বার যে বারণ করে, অনস্ জন্ম অর্থাৎ যে পুনর্জন্ম বারণ করে। অথবা বর—শ্রেষ্ঠ, অনস্ জল +অ, ঈ। যে স্থান শ্রেষ্ঠ জলের (গঙ্গার) উপর আছে অর্থাৎ কাশী। সম্যক্ গাঙ্গ-দেশে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সর্ব্বসময়ে ইহার শোভা ও সৌন্দর্য্য সমান বোধ হয়। জল বৃদ্ধি হইলে ইহার শোভার অন্যথা হয় না, বরং কালের বা জলের গতি দ্বারা শোভার

বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। নিদাঘে জল হ্রাস হইলে জাহ্নবী যখন মন্দ মন্দ ভাবে মন্দরগতিতে নগরীর পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হয়, অপর কূলে বালুকা রাশি প্রশস্ত পুলিন বিস্তার করিয়া ইহার আয়তনের চারি ভাগের তিনভাগ গ্রাস করিয়া ফেলে, তখন অবিশ্রান্ত সোপানাবলী স্তরে স্তরে নিম্ন হইতে নিম্নতর দেশে অবরোহণ পূর্ব্বক কি চমৎকার শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। অধোদেশে অগাধ জলরাশি মধ্যে প্রশস্ত সোপানশ্রেণী ইতস্ততঃ চৈত্য, দেউল ও যূপ মণ্ডপে পরিশোভিত, এবং উর্দ্ধে বিশাল নগরী দেবপুরীর ন্যায় বিরাজিত। বর্ষাগমে কাশীর শোভা ভিন্নরূপ। যে স্রোত ইতিপূর্ব্বে অর্দ্ধ মাইল আয়তনের মধ্যে মন্দ মন্দ প্রবাহিত ও পারদ চাদরের ন্যায় বিস্তৃত ছিল, এখন সে চতুর্গুণ আয়তন বৃদ্ধি করিয়া সমুচ্চ পুলিনদেশ প্লাবন পূর্ব্বক, উভয়কূলে ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ও ভীষণ কল্লোলে পৃথিবী প্রকম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণকূলের তো কথাই নাই, পল্লী বন উপবন সমস্তই স্রোতোমুখে নিপতিত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। বাম কূলে জলরাশি সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া নগরের পত্তন দেশ বিধৌত করিতেছে। এ সময়ে গঙ্গার জল এখানে ৩০ হইতে ৪৫ পাদ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। সমস্ত ঘাট ও তত্রত্য দেউল ও চৈত্য সকল মগ্ন করিয়া জলস্রোত তীরস্থ পথোপরি প্রবাহিত হয়। এই সময় জলবৃদ্ধির পরিমাপক তিনটী তীর্থের কল্পনা করা হইয়াছে প্রথমটী ইন্দ্রদ্যুম্ন তীর্থ। মণিকর্ণিকার উপরে অশ্বত্থমূলে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহার মস্তকোপরি অর্দ্ধহস্ত প্রমাণ জল উত্থিত হইলে, ইন্দ্রদ্যুম্ন তীর্থ যোগ হয়। এ বৎসর ১লা ভাদ্র এই যোগ সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দিনেই সন্ধ্যা হইতে জল কমিতে আরম্ভ হয়। আমরা ২রা ভাদ্র প্রাতঃকালে শিবের মস্তক পর্য্যন্ত প্রবাহ দেখিয়াছি। ইন্দ্রদ্যুম্ন যোগে উক্ত শিবের মগ্ন মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া সংকল্প-পূর্ব্বক পাণ্ডার প্রমুখ মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে স্নান করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়। মণিকর্ণিকা ঘাটের উপরিস্থ বিষ্ণুমন্দির হইতে গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে। ইহার একটু উপরে গঙ্গার উপর লছমন বালজীর কক্ষ হইতে প্রায় সমস্ত গঙ্গা-তীরের দৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়। সমস্ত দেশ প্লাবিত, কেবল কাশীর উপরে অগণ্য চূড়া, স্বর্ণময় কলস ও বিচিত্র ধ্বজ পতাকা এবং সমুচ্চ শিখরবিশিষ্ট সুরম্য হর্ম্যাবলী, কারুময় দেবমন্দির ও প্রশস্ত মসজিদ সকল ভাসাইয়া জল কেলি করিতেছে।

দ্বিতীয় ভাস্কর পুস্কর ও কুরুক্ষেত্র তীর্থযোগ। অসী সঙ্গমের কিঞ্চিৎদূরে অসীর উপর কুণ্ড বা পুষ্করিণী আছে। ইহা অসীর সহিত সংযুক্তা, গঙ্গার জলের সহিত অসীর জল বৃদ্ধি হইয়া

যখন এই পুষ্করিণীটি প্লাবিত হয়, তখনই "পুষ্কর" ভাস্কর তীর্থ হইয়া থাকে। এ বৎসর ইহার ১২টী সোপান অবশিষ্ট ছিল, সুতরাং তীর্থযোগ হয় নাই। ইহার কিছু দূরেই কুরুক্ষেত্র কুণ্ড। সম্মুখে কুরুক্ষেত্রেশ্বর মহালিঙ্গ। পুষ্কর ভাস্কর হইলেই কুরুক্ষেত্র যোগ হয়। উভয় কুণ্ডের উচ্চতা সমান বলিয়া বোধ হয়।

তৃতীয়, মৎস্যোদরী তীর্থ। রাজঘাটের নিকট বিশ্বেশ্বর ও ত্রিলোচন গঞ্জের মধ্যবর্ত্তী একটী উদ্যানের মধ্যে এই কুণ্ডটী প্রতিষ্ঠিত। ইহা এখন ভগ্ন অবস্থাপন্ন ও জলশূন্য। গঙ্গার প্রবাহ যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া নিকটস্থ স্থান সকল জলে প্লাবিত করিয়া কুণ্ডটীকে পরিপূর্ণ করে, তখনই মৎস্যোদরী যোগের সংঘটন হয়। মৎস্যোদরী তীর্থ হইলে প্রায় নগরের অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হয়। শুনিলাম বহুদিন এরূপ যোগ হয় নাই, সুতরাং কুণ্ডটী অব্যবহার্য্য হইয়া ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। বিশেষতঃ নগরের এই অংশ এখন যেরূপ জনাকীর্ণ ও উন্নত, তাহাতে বোধ হয় আর কখনও মৎস্যোদরীর পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা হইবে না।

পূর্ণ বর্ষায় অসীঘাট দর্শনে মনোভাব।

রাগিণী সরফর্দা। তাল একতালা।

আ মরি কি আজ! পরিয়াছ সাজ
গিরিরাজ-সুতা গঙ্গে!
গলে বীচিমালা, ভালে রুলি ডালা
ঘন ফেণ ঢালা অঙ্গে। ১
আবিল জীবন অনিল ভরে
বেলায় খেলায়, বিহরে চরে,
জল-বল্‌কলা, দুলিছে মেখলা,
পুলিন লীন তরঙ্গে! ২
হাসিছ ভাসিছ কেলি আয়াবে,
হেলিছ, দুলিছ গলিছ ভাবে,
কল কল স্বরে, কার গান ক'রে
নাচ তালে তালে রঙ্গে! ৩

সুকন্যা বিভুবালা।*

আমার স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণী বলিতেন "পুড়্‌বে মেয়ে হবে ছাই, তবে তার গুণ গাই।" জীবিত কন্যার কোনও গুণ ব্যাখ্যা তাঁহার সহ্য হইত না। বস্তুতঃ মানব জীবনে কত পরীক্ষা আছে, যতদিন সে সকল অতিক্রম করিয়া আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস ও চরিত্রবলের পরিচয় দিতে না পারে, ততদিন কি পুত্র কি কন্যা কাহাকেও ভাল বলিয়া প্রশংসা করা যায় না। কন্যা বিভুবালার জীবন লীলা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার মর্ত্ত্যদেহ পুড়িয়া শ্মশানের ছাই হইয়াছে, এখন তাহার সদ্‌গুণের সমালোচনা করিলে অসঙ্গত হইবে না। তাহার গুণের আলোচনার পূর্ব্বে তাহার সংক্ষিপ্ত একটু জীবনবৃত্ত বর্ণিত হইতেছে :—

* বা বো সম্পাদকের তৃতীয় কন্যা।

বিভুবালা ১২৮৬ সালের ৬ই পৌষ এই মহানগরে সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট ৪৪ নং ভবনে ভূমিষ্ঠ হয়। দুই কন্যার পর তৃতীয় কন্যা জন্মিলে এদেশের প্রথানুসারে তাহার প্রতি অনাদর হইবার কথা, কিন্তু তাহার পিতা মাতার মনে সেরূপ ভাব হয় নাই। কন্যাটী বরং বিশেষ সুলক্ষণাক্রান্তা বলিয়া বিশেষ আদরের পাত্রী হইয়াছিল। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর, তখন সে বয়সের অতীত অনেক শিক্ষার পরিচয় দেয়। একটী হিন্দুস্থানী ভৃত্য তাহার পরিচারক ছিল, সে তাহাকে আপনার ভাষায় কত কথা শিখাইত! তাহার নিকট একটী সুন্দর গান শিখিয়া সে গাইত "মিঠে মিঠে রাম নাম কউরে জি।" ৩ বৎসরের সময় সে পরিজনদিগের দেখা দেখি ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাইতে ও প্রার্থনা করিতে ভাল বাসিত। তাহার একটী ছোট প্রার্থনা সে প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া করিত, আমাদের কোনও শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক বন্ধু ছেলেদের জন্য এইরূপ সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাকে বিভুর প্রার্থনা বলেন। সে এই—

"হে দয়াময়, তুমি আমাকে সমস্ত রাত্রি নিরাপদে রক্ষা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি আজিকার দিন আমাকে ভাল রাখ, আমাকে ভাল মেয়ে কর, তোমাকে প্রণাম করি।"

শৈশবে তাহার অত্যন্ত উদরের পীড়া ও সর্দ্দির পীড়া হয়। সে সময়ে পশ্চিমে বায়ু পরিবর্ত্ত করিয়াও কোন উপকার হয় না, শেষে এমন হইল যে তাহার বাঁচিবার আশা রহিল না। কিন্তু কোনও প্রবীণ কবিরাজের মুষ্টিযোগে আরোগ্য লাভ করে এবং সেই অবধি বরাবর বেশ সুস্থশরীর ছিল।

বিভুবালাকে ইহার মাতা "পয়মন্ত মেয়ে" বলিয়া আদর করিত, কারণ তাহার পরেই প্রথম পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং কলিকাতার বর্ত্তমান বসতবাটীর জন্য ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্ভিন্ন পিতার অনেক ঋণ ছিল, তাহা সেই সময়ে পরিশোধিত হয় এবং পারিবারিক সুখ সৌভাগ্য আরও কোন কোন বিষয়েও লক্ষিত হইয়াছিল।

বিভুবালা ৪।৫ বৎসর হইতে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করে। তাহার এরূপ বুদ্ধি যে তাহার জ্যেষ্ঠ ভগিনীরা অনেক সময়েই তাহার নিকট হার মানিত। আলিবাবার গল্পে মর্জ্জিয়ানার আশ্চর্য্য বুদ্ধিতে চোরেরা পরাস্ত হয়, ভগিনীরা এই গল্প শুনিয়াছিল এবং তাহারা ইহাকে "মর্জ্জিয়ানা" এবং পরে "জিরি" নামে ডাকিত। লেখাপড়ার প্রতি তাহার আশ্চর্য্য মনোযোগ ছিল—যাহা ধরিত, তাহা শিক্ষা না করিয়া ছাড়িত না। অতি শৈশবে বড় বড় বাঙ্গালা কবিতা মুখস্থ করিয়া সর্ব্বদা আবৃত্তি করিত। বিভুবালা প্রথমে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিক্টোরিয়া কলেজে দিদীদের সহিত অধ্যয়ন করিত, পরে বেথুন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া

বরাবর সেইখানে পড়িতেছিল। কয়েক বৎসর মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী পরীক্ষা দিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়। ১৮৯৮ সালে বেথুন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ইহার পরে তাহার মাতৃবিয়োগে পরিবারে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে, বিশেষতঃ তাহার ছোট ভগিনীটী ভয়ঙ্কর হাঁপানী রোগে জীবন্মৃত অবস্থায় ৩ বৎসর কাল কাটাইয়াছিল, রাত্রিকালে অধিকাংশ সময় হাতে পাখা করিয়া ইহাকেই তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইত। এই অবস্থায় ফাষ্ট আর্ট্স পরীক্ষা দিয়া তাহাতে ১৮৯৯ সালে উত্তীর্ণ হয়। "বি এ" পাঠ আরম্ভ হইলে সংস্কৃতে অনর দিবার জন্য অভিলাষিণী হয় এবং তাহার জন্য পাঠ্য পুস্তক সকল অধ্যয়ন করে। কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় শ্রেণীর মধ্যে তাহাকেই সংস্কৃতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অনর অধ্যয়নে অনুমতি দেন ও সাহায্য করেন। পণ্ডিতবর তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ও তাহাকে উৎসাহ দান করিবার জন্য সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক পুরস্কার দেন এবং সময় সময় পাঠের সাহায্য করিবার আশ্বাস দেন। ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে তাহার চক্ষুর পীড়া হয় এবং তাহাতে রাত্রিকালীন পাঠ এক প্রকার বন্ধ করিতে হয়। এই জন্য তাহার পিতা তাহাকে অনর পাঠ বন্ধ করিতে বলেন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে বি এ পরীক্ষার জন্য মনোনীত হইয়া 'ফি'র টাকা জমা দেয়। কিন্তু মার্চ্চমাসে পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ভয়ঙ্কর জ্বর হয়। জল বসন্ত হইয়া এই জ্বরের বিরাম হয়। কিন্তু বসন্তের আরোগ্য স্নানের পর অপরাহ্নে অল্প অল্প জ্বর হইতে থাকে। বি এ পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হইল। এদিকে চিকিৎসকেরা ম্যালেরিয়া জ্বর অনুমান করিয়া জলবায়ু পরিবর্ত্তের উপদেশ দেন। ডায়মণ্ড হারবরে একমাস থাকিয়া কোনও উপকার হইল না। পরে পচম্বায় যাওয়া হয়। সেখানেও বৈকালে ৯৯ ডিগ্রী জ্বর কিছুতেই যায় না—বিশেষতঃ রাত্রিতে মাথা ঘামে। তত্রত্য বহুদর্শী ডাক্তার লিবরের দোষ অনুমান করিয়া তদুপযোগী ঔষধ দেন। কিন্তু তাহাতে পীড়ার আরও বৃদ্ধি হয়। ১৯এ মে রাত্রে কাশিতে কাশিতে চাপ চাপ রক্ত উঠে। পরে কলিকাতায় আসিয়া আলোপাথিক, হোমিয়োপ্যাথিক, কবিরাজী ও সূক্ষ্ম আয়ুর্ব্বেদীয় প্রভৃতি নানা চিকিৎসার পরীক্ষা হয়, কিন্তু কিছুতেই সুফল দর্শিল না। কোন কোন দৈব ঔষধও সেবন ও ধারণ করান হয়, তাহাতেও কোন উপকার হইল না। অবশেষে গত ১৯এ আগষ্ট (পীড়াভোগ ঠিক ৩ মাস পূর্ণ করিয়া) প্রাতে ১১টার সময় প্রাণবায়ু নিঃশব্দে বহির্গত হইল।

বিভুবালার চিকিৎসার জন্য যাঁহারা বিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অনুগ্রহ প্রকাশ

করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার আর এল দত্ত, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ডাক্তার ডি এন রায়, কবিরাজ গোপীনাথ রায় ও ডাক্তার বি বি বটব্যালের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহাঁদের নিকট বিভুবালার পরিজনগণ চির-ঋণী। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ধর্ম্মবন্ধুগণ এবং বেথুন কলেজের লেডী প্রিন্সপাল চন্দ্রমুখী বসু, ঐ কলেজের ও ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ এবং আরও অনেক বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া উপদেশ, প্রার্থনা ও সঙ্গীত এবং সেবা শুশ্রূষাদি দ্বারা রোগীর যে উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্যও শোকার্ত্ত পরিবার বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই ঘটনায় যাঁহারা সমবেদনা প্রকাশ করিয়া শোকার্ত্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, তাঁহাদেরও দয়া স্নেহ ভুলিবার নয়।

বিভুবালার কয়েকটী বিশেষ গুণ ছিল :—

শুচিতা—সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে নিজে থাকিবে ও বাটীর সকলকে রাখিবে, এজন্য তাহার বড়ই চেষ্টা ছিল, এবং এ বিষয়ে সে জননীর প্রতিনিধি হইয়া সকলকে শাসন করিত। শরীর কি বস্ত্রাদি একটু অশুচি হইলে তাহার সহ্য হইত না। এমন যে উৎকট পীড়ায় প্রায় ৩ মাস শয্যাস্থ ছিল, ইহাতেও শয্যাবস্ত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা চাই। যক্ষ্মারোগে থুথু গয়ের প্রায় অবিশ্রান্ত উঠিয়াছে, তাহা তুলিয়া একবার মুখ ও হাত না ধুইলে নয়। দাস্ত শয্যায় শুইয়া হইবে না, শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া পুনরায় শয্যায় আনিয়া না শোয়াইলে তাহার মনঃপূত হইত না। এজন্য সেবিকা ছোট ভগিনীকে কত সতর্ক করিত। বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএ তাহাকে রাখিবার জন্য কতবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু অশুচিতার ভয়ে কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই।

লজ্জাশীলতা—লোক-সমক্ষে বাহির হইতে বা লোকের নিকট আপনার বিদ্যা ও গুণের পরিচয় দিতে একান্ত সঙ্কুচিত হইত। আপনাকে আপনি এমন সযত্নে রক্ষা করিত যে তাহাকে সে জন্য কখনও কোন কথা বলিতে হয় নাই। এমন যে রোগযাতনা, তাহাতেও তাহার অঙ্গবস্ত্র একটু শিথিল থাকিত না। মল মূত্র ত্যাগের সময় অন্য পুরুষ দূরে থাকুক, পিতা গৃহ হইতে বাহির না হইলে চলিত না।

বৈরাগ্য—এত বড় মেয়ে হইয়াছিল, বেশবিন্যাসের প্রতি আদৌ দৃষ্টি ছিল না, ভোজ বা আমোদস্থলের নিমন্ত্রণে পারত পক্ষে যাইতে চাহিত না। ভাল খাইবার আগ্রহ দূরে থাকুক, অনাহার ও উপবাসেই হাস্যবদনে অনেক দিন কাটাইত। শৈশবাবধি নিরামিষ ভোজনে অভ্যস্ত। রাত্রি জাগিয়া পড়িত, একটু বেলায় উঠিত। তৎপরে পাঠ দেখিয়া স্নানাদি করিতে বিলম্ব হইত। কোন দিন খাইতে বসিয়াছে, কোন দিন বসে নাই, বিদ্যা-

লয়ের গাড়ী আসিল, না খাইয়া বা দুই এক গ্রাস গালে গুঁজিয়া অমনি চলিয়া যাইত। জলখাবারের পয়সা লইত, না খাইয়া কলম কাগজ খাতা কিনিয়া আনিত। পরে প্রায় সন্ধ্যাকালে বিদ্যালয় হইতে আসিয়া পরিষ্কার হইয়া তবে আহার করিত। তাহার রোগ-শয্যায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ঈশ্বরেচ্ছায় এবার যদি বাঁচিয়া উঠ, কিরূপে জীবন কাটাইবে? তাহার উত্তরে বলিল "আমার সংসারের সাধ কিছুই নাই, আমি সংসারে যাইব না। যদি বাঁচি ত ঈশ্বরের সেবায় জীবন কাটাইব।"

সেবা—তাহার পাঠাদির নানা ব্যস্ততা থাকিলেও পরিজনদের সেবায় কাতর হইত না। মাতার কত শুশ্রূষা করিয়াছে! মাতৃবিয়োগের পর ছোট ভগিনীটী একাদিক্রমে ৩ বৎসর কাল হাঁপানীর দারুণ ক্লেশ ভুগিয়াছে। তাহার ছোট দিদী তাহার সঙ্গিনী, কত রাত্রি নিদ্রাত্যাগ করিয়া সমস্তক্ষণ তাহাকে বাতাস করিয়াছে এবং নানা প্রকারে তাহাকে সচ্ছন্দে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। রন্ধনে বড় পটু ছিল না, কিন্তু অনেকগুলি সুন্দর মিষ্টান্ন তৈয়ার করিতে শিখিয়াছিল, পিতা প্রভৃতিকে যত্নপূর্ব্বক তাহা খাওয়াইয়া সুখী হইত। রোগের অবস্থায় নিজে না খাইয়াও এইরূপ সেবায় সুখানুভব করিয়াছে।

অধ্যবসায়—বিদ্যাশিক্ষায় তাহার কি একাগ্রতা ও ঐকান্তিক যত্ন ছিল, বলিয়া শেষ করা যায় না। যে গৃহে শয়ন করিত, তাহারই এক কোণে একখানি চেয়ার টেবল, সেই টেবলে পুস্তকগুলি সজ্জিত থাকিত এবং নিজে অনন্যমনে পাঠে নিমগ্ন থাকিত। তাহাকে খাইবার শুইবার জন্য বার বার স্মরণ করাইয়া দিতে হইত। বাটীতে এত লোকের এত কোলাহল, কোনও দিকে তাহার দৃক্‌পাত নাই। বালকদিগের শিক্ষার জন্য পিতা মাতা ও প্রাইবেট শিক্ষকদের সাহায্য প্রয়োজন হইত, তাহার কিছুই হইত না। কেবল কোনও বিষয় স্বয়ং চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে না পারিলে পিতা প্রভৃতির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। রাত্রে তাহার এক প্রদীপ তৈল চাই, তাহা হইলেই সন্তুষ্ট। নিজে লিখিতেছে পড়িতেছে, অঙ্ক কসিতেছে, রচনা করিতেছে। সে যে সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিত, যাবজ্জীবনে কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। তাহার মৃত্যুর পর অনুসন্ধান করিয়া কবিতার খাতা সকল বাহির হইয়াছে। নিজের অসাধারণ অধ্যবসায় ও যত্নে বি এ পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নানা বিঘ্ন বাধায় এফ এ পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই, এ জন্য বড় ক্ষুণ্ণ ছিল এবং অনর শুদ্ধ বি এ পাস করিয়া সে ক্ষতি পূরণ করিয়া লইবে, এই মনের আশা ছিল, রোগ ও মৃত্যু আসিয়া সে আশা নির্ম্মূল করিল।

ধর্ম্মানুরাগ—শৈশব হইতে প্রার্থনা ও

সঙ্গীতে তাহার যেরূপ অনুরাগ ছিল তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। জ্ঞানোদয় হইতে ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। তাহার বয়স যখন ১২বৎসর, তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীদ্বয় ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হয়, সেও আগ্রহ সহকারে তাহাদের সহিত দীক্ষা গ্রহণ করে। পরে নিষ্ঠাপূর্ব্বক নির্জনে নিত্য উপাসনা করিত এবং যখন অবসর পাইত, তখন ভক্তিভরে সঙ্গীত করিত। তাহার কতকগুলি প্রিয় সঙ্গীত ছিল, যথা—

"তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন।" "জয় দীন দয়াময় নিখিল ভুবনপতি প্রেমভরে করি তব নাম।" "থাকব্‌ না আর এ পাপ রাজ্যে ব্রহ্মধামে যাব চলে।" "মিটিল সব ক্ষুধা তোমারি নাম সুধা চলরে ঘরে লয়ে যাই।" "তোমাকেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা।" "তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন" ইত্যাদি।

তাহার ধর্ম্মবিশ্বাস এত দৃঢ় এবং ভগবদ্‌ভক্তি এত গভীর আমরা জানিতাম না। তাহার রোগশয্যায় ইহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছি। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বদা তাহার নিকট থাকিয়া সেবা করিত, তাহার লিখিত কয়েকটী কথা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"দারুণ রোগশয্যায় শুইয়াও ছোট দিদীর ঈশ্বরের প্রতি কত দূর ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, তাহা বলিবার নহে। সর্ব্বদাই ভগবানের নাম করিবে ও তাঁহার গুণগান শুনিবে এই ইচ্ছা। সে সর্ব্বদাই বলিত "ভগবান্, আমাকে তোমার ঐ পুণ্যময় চরণে স্থান দাও।" রোগের যন্ত্রণায় যখন বড় অস্থির হইত, তখন বলিত "আমি বুঝিয়াছি, তুমি আমার পাপ ধোয়াইবার জন্য আমাকে এত কষ্ট দিতেছ। এক চুলের মত পাপ থাকিলেও ওখানে যে কেহ যাইতে পারে না। তবে দেব! শীঘ্র শীঘ্র ধোয়াইয়া দও।" আমরা যখন বলিতাম "তুমি আমাদের ছেড়ে যাইবে, সেখানে গেলেত ভালবাসা থাকিবে না।" তখন সে বলিত "ভালবাসা থাকিবে না কেন? মোহ থাকিবে না, ভালবাসা থাকিবে।" আমরা বলিতাম "তুমি যাইবে, আমরা থাকিব কি করিয়া?" তখন বলিত "কেন ভগবান্‌কে ডেকে তাঁর নাম নিয়ে থাক্‌বি। যখন বড় কষ্ট হবে, প্রাণপণে ঈশ্বরকে ডাক্‌বি, তিনি সব কষ্ট দূর করিবেন। এ পৃথিবীতে ত লোক চিরদিন থাকবে না, কেহ আগে কেহ পাছে যাইবে, সকলেই এক পথের যাত্রী। তবে আমাকে যাইতে কেন বারণ কর? তোমরা কি আমার এই কষ্ট দেখিতে ভালবাস! যদি না বাস ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর তিনি আমাকে শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার পুণ্যময়, রাজ্যে লইয়া যান।" পিতা কাছে আসিলে বলিত "বাবা! তুমিত তোমার কর্ত্তব্য যাহা করিলে, এখন আমাকে যাইতে দেও না কেন? তুমি একবার ঈশ্বরের

নিকট প্রার্থনা করিলেই তিনি আমাকে লইয়া যাইবেন। আমার জন্য কষ্ট বোধ করিও না, আমি শান্তিধামে যাইতেছি। সেখানে রোগ শোক দুঃখ কিছুই নাই, সেখানকার মত সুখের স্থান কোথায়?” তাহার এত দূর বিশ্বাস ছিল যে, প্রাণ বাহির হইবার পূর্ব্বেও বলিতেছে “ভগবান্! এইবার আমাকে লও তোমার ঐ পুণ্যময় রাজ্যে।” কত আশ্চর্য্য স্বর্গীয় দৃশ্যের বর্ণনা করিত, “কি সুন্দর সুন্দর পাখী উড়িতেছে, আমি কি উহাদের সঙ্গে যাইব? আহা! আকাশে এমন উজ্জ্বল তারা কখনও দেখি নাই।” মধ্যে মধ্যে স্বর্গীয় জননীকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া বলিত “মা আসিয়াছেন, মা তোমাদিগকে বলিতেছেন যে আর ওর কষ্ট দেখিতে পারি না, তোমরা উহাকে আমার নিকটে দাও। আহা! ঐ স্বর্গের উদ্যানে কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। মা! তুমি যে আমাকে ঐ ফুল আনিতে বলিতেছ, কিন্তু আমিত যাইতে পারিতেছি না।” আমাকে মার নিকট যাইবার জন্য কত কথা বলিত এবং যখন মাকে দেখিত, উপর দিকে হাত তুলিয়া বলিত “ঐ দেখ্ মা।” কখনও ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীর কথা বলিত এবং বলিত তাহার ধ্যান সমাপন হইলে তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইও। বলিত “আমি সন্ন্যাসীর কাছে ব্রত লইয়াছি, আমাকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইও না, খাওয়াইলে তোমাদের ভয়ানক পাপ হইবে।” একদিন সে অজ্ঞান হইয়া গিয়া বলিল “সকলকে ডাক, আমি যাইতেছি। আমি বেশ যাইতেছি, কোনও কষ্ট নাই। মা আসিয়াছেন, আরও কত কে!” অজ্ঞান হইয়া কেবল প্রার্থনা ও ধর্ম্মের নানা রকম কথা বলিত। জ্ঞান হইলে বলিত, আমি কি স্বর্গের সুখ অনুভব করিতেছিলাম, আমার কোনও কষ্ট ছিল না, আবার এই পাপ রাজ্যে যন্ত্রণা ভোগ করিতে আসিলাম। মা, আমাকে কেন ফিরাইয়া দিয়া গেলে?”

“সে লোককে দান করিতে ও খাওয়াইতে ভাল বাসিত। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে আমাকে বলিল “দেখ্ আমার যা কিছু আছে গরিবদিগকে দান করিস্; আর বাবার কাছে কিছু চেয়ে নিয়ে গরিবদিগকে দিস্ আমি চলে গেলে।” মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে বলিতেছে “কাকাবাবুকে, ছোট মামাকে ও আরও কাহাকে কাহাকে ছোট ছোট কচুরী খাওয়াইতে ইচ্ছা করে। বাবা বলিলেন “তুমি খাইবে”, বলিল “না, আমি খাইব না, সকলকে খাওয়াইতে চাই।” বাবা বলিলেন আচ্ছা, সারিয়া উঠিয়া যাহাকে যত ইচ্ছা খাওয়াইও, তাহাতে আর কিছু বলিল না।

“গান শুনিতে খুব ইচ্ছা ছিল, কেহ ভাল গান গাইলে শত মুখে তাহার প্রশংসা করিত। গান গাহিতে বলিলে কেহ না গাহিলে সেই ক্ষীণকণ্ঠে এমন সুন্দর গান গাহিত যে বলিবার নহে। মৃত্যুর দিন প্রাতে আমাকে বলিল “আজি

তোদের ছুটি।" তখন বুঝি নাই সেই তাহার শেষ দিন। প্রাতঃকাল অতীত হইতে না হইতে তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল। সে যেন শান্তি নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। ধন্য দয়াময় তোমার শক্তি, ধন্য তোমার কৌশল! আমরা পাপচক্ষে কিরূপে তাহা দেখিব? তুমি কোথা দিয়া তাহার প্রাণবায়ু বাহির করিয়া লইলে আমরা জানিতেও পারিলাম না।"

বিভূবালার রোগশয্যা একটী বিশেষ শিক্ষাস্থান হইয়াছিল এবং যাহারা তথায় তাহার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, কোমল সহানুভূতি ও প্রবল ভগবদ্ভক্তি দর্শন করিয়াছে, তাহারাই মুগ্ধ ও উপকৃত হইয়াছে। কতদিন যাতনার মধ্যে সুস্বরে ব্রহ্মসঙ্গীত ও হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিয়াছে। যখন নিজের স্বর ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়াছে, বলিয়াছে "আমি আর পারি না বাবা, তুমি গান গাও, প্রার্থনা কর, আমি চলিলাম।" অনেক আশ্চর্য্য তত্ত্বকথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইত। একদিন বলিতেছে "আমি একটা না দুটা? শরীর দেখাইয়া বলিতেছে এটাত উঠিতে ও নড়িতে পারে না, কিন্তু আমিত খুব বেড়াইতে পারি, আমি মনে করিলে এখনি উঠিয়া ছাদ ও বাড়ীর চারিদিক্ ঘুরিয়া আসিতে পারি।" দেহ ও আত্মার পার্থক্য যেন সুস্পষ্ট দেখাইতে লাগিল। মৃত্যুর ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে বলিল "ঈশ্বরের নামে যা হয়, ঔষধেত সে উপকার হয় না। ভাল করে নাম শুনাও।" কতবার বলিয়াছে "আমার জীবনে কোনও কায হইল না, আমার এখানে থাকিয়া ফল কি? আহা! ও দেশ কি সুন্দর দেশ! বাবা! তুমি একবার যাও বল না।" আর গাহিত "থাক্‌ব না আর এ পাপ রাজ্যে ব্রহ্মলোকে যাব চলে।" শেষ পর্য্যন্ত এমন স্মৃতি, কেহ দেখিতে আসিলে আগে তার কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিত এবং আত্মীয় পরিজনের এক একজনের নাম করিয়া প্রত্যেকের নিকট ক্ষমা চাহিয়াছে ও প্রত্যেকের নিকট বিদায় লইয়াছে। মৃত্যুর সময় খাবিখাওয়া বা মুখবিকৃতি কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। নিশ্বাস পড়িতে পড়িতে নিস্তব্ধ হ‹য়া গেল, মুখাকৃতি আরও উজ্জ্বল হইল, জীবিত কি মৃত অনেকক্ষণ বুঝিতে পারা গেল না। লোকে বলে "জপ কর, তপ কর মরতে জান্‌লে হয়।" ইহার মৃত্যু বড় প্রার্থনীয় সুখের মৃত্যু।

বিভূবালার লোকান্তর গমনের পর তাহার পিতা যে স্মৃতি উপহার দেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল। আর কয়েকটী উপহার বামারচনার সহিত দৃষ্ট হইবে।

দেবকন্য বিভূবালা দেবতার বরে
এসেছিলে শুভক্ষণে আমাদের ঘরে।
কত সুখ কত শান্তি করিয়া বিস্তার,
আশার অলোকপূর্ণ করিলে সংসার।
শিশুকাল হতে তুমি সুবুদ্ধি সরলা,
জান নাই সংসারের কপটতা ছলা।
যা বুঝেছ সত্য, তায় ছিল দৃঢ় পণ,
বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ করনি কখন।

সহজ ঈশ্বরভক্তি বিশ্বাস তোমার,
ধরেছিল বাল্য হ'তে প্রার্থনা আকার।
মধুর কণ্ঠেতে তব বিভু গুণগান,
সুধাধারা ঢালি ঢালি জুড়াইত প্রাণ।
আপনি ডুবিয়া রসে ডুবাতে সবায়,
সে মধুর কণ্ঠ ধ্বনি শুনিব কোথায়?
বিদ্যা শিখিবার তরে কি যত্ন তোমার!
করেছিলে অধ্যয়ন তপস্যার সার।
গৃহ-কোণে যোগাসনে বসি অনুক্ষণ,
পুস্তকের সহ দিন করিতে যাপন।
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা সুখের বাসনা,
ব্রহ্মচারিণীর বেশে করিলে সাধনা।
গৃহ মধ্যে রোগ শোক কত কোলাহল!
কিছুতেই মন তব হয়নি চঞ্চল।
যে পরীক্ষা দেছ, তাতে হয়েছ সফল,
ধন্য ধন্য ধন্য তব সাধনার বল!!
জীবনের প্রভাত না লইতে বিদায়,
কি কাল ব্যাধিতে আসি ধরিল তোমায়।
দেখিতে দেখিতে হলে অস্থি-চর্ম্মসার,
ক্ষত বক্ষ পৃষ্ঠ জিহ্বা কণ্ঠনালী আর।
কাশিতে কাশিতে প্রাণ হইল সংশয়,
গায় জ্বালা পায় জ্বালা দেহ জ্বালাময়।
দিবানিশি কি আগুণে মাথা জ্বলে যায়,
"বাতাস বাতাস" বিনা নাহিক উপায়।
এ অগ্নি-পরীক্ষা মাঝে দেববালা বিভু,
কি দেখালে কি শুনালে ভুলিব না কভু!
সদা শুচি লজ্জাশীলা যাবৎ জীবন,
শয্যা বস্ত্র পরিষ্কার রাখিতে যতন।
কেবল ঈশ্বর নাম—কেবল প্রার্থনা,
কেবল স্বর্গের কথা তোমার সান্ত্বনা।
পাপ রাজ্য ছাড়ি ব্রহ্মধামে যাবে চলে,
"ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও" যাচিছ সকলে।
একে একে বিদায় সবার কাছে নিয়ে
ধ্যানেতে মুদিলে আঁখি তন্ময় হইয়ে,
পড়িছে নিঃশ্বাস তব, দয়াময় নাম
জপিছ রসনা পরে, নাহিক বিশ্রাম!
দেখিতে দেখিতে সব হলো সমাপন,
কি শান্তি-নিদ্রায় তুমি হইলে মগন!
স্বর্গপথে দিব্যরথে করি আরোহণ
অমর ধামেতে আসি অমরের মাঝে;
মাতার সহিত তব শুভ সম্মিলন,
আনন্দ-বাজনা তাই ত্রিদিবেতে বাজে।
অক্ষয় ভাণ্ডার হতে জগৎ জননী,
রত্ন অলঙ্কার লয়ে সাজান সুবেশে;
দেবলোকে চারিদিকে আজি জয়ধ্বনি,
সুখে থাক বিভুবালা! সে শান্তির দেশে।

জল ও হাওয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জমিদার রাজচন্দ্র রায়ের সুবৃহৎ বাড়ীর একতল অট্টালিকার একটি নির্জ্জন কক্ষে রোগ-শয্যায় শয়ানা—একজন গৌরকান্তি স্নিগ্ধ-জ্যোতিরূপিণী রমণী। রমণী তন্বঙ্গী এবং তাহার দেহযষ্টি সুগঠিত, কেশ

গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। ইহারই নাম সুনীতি। সুনীতি রায় মহাশয়ের পুত্রবধূ। বহুদিন-ব্যাপী দারুণ রোগে যদিও আজ সে চলৎশক্তি-রহিত ও শয্যাশায়িনী, তথাপি তাহার অতুল সৌন্দর্য্যের বিমলচ্ছটায় গৃহ আলোকিত। কিন্তু তাহার সেই অনিন্দিত গৌরকান্তি রোগ-যন্ত্রণায় দিন দিন ম্লান হইতে ম্লানতর হইতেছে। নবীন জীবন প্রদীপ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। এই রোগযন্ত্রণার উপর দিয়া সুনীতির জীবনের দুই বৎসর কাটিয়া গেল। শত চিকিৎসকের সুচিকিৎসা বিফল হইয়াছিল, তথাপি রীতিমত চিকিৎসা চলিতেছিল। কিন্তু আজ চিকিৎসকগণ একত্র হইয়া রাজচন্দ্র রায়ের নিকট স্পষ্ট জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে এ ব্যাধি দুরারোগ্য, চিকিৎসায় আর কোনও ফল হইবে না।

যে দেখিতেছে সেই বলিতেছে জীবনের আর আশা নাই। পুত্রবধূর সেই পাণ্ডুবর্ণ মুখ কৃশ দেহ অবলোকন করিয়া রাজচন্দ্র রায়ের হৃদিমর্ম্মিণী আশঙ্কা বলবতী হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় চিঠি লিখিলেন—

"প্রাণের পুত্র জীবেন্দ্র,

এত চিকিৎসাতেও বধূমাতার ব্যাধির কোনরূপ উপশম বুঝিতেছি না। আমার প্রাণে বড় ভয় হইয়াছে। তুমি একবার আসিতে পারিলে ভাল হইত।

আশীর্ব্বাদক
তোমার পিতা।"

জীবেন্দ্র পিতার একমাত্র পুত্র, তাহাতে আবার বড় জমীদারের ছেলে। এমত স্থলে তাহার বীণাপাণি ঠাকুরাণীকে পায়ে ঠেলিবারই কথা ছিল। কিন্তু জীবেন্দ্র তেমন চরিত্রের লোক নন। তিনি রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বি, এল পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন এবং কলিকাতায় মস্ত এক কারবার খুলিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। জীবেন্দ্রের প্রাণে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ ও প্রচুর স্নেহ মমতা পরিলক্ষিত হয়।

আজ তিনি পিতার পত্র পাইয়া বসিয়া পড়িলেন। সুনীতি কাতর, তাহা তিনি জানেন। ব্যাধি গুরুতর, কোন চিকিৎসকই আরোগ্য করিতে পারিতেছে না তাহাও তিনি জানেন। কিন্তু আজ পিতার পত্র পাইয়া তাঁহার মন অস্থির হইল। নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রু-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দিবাবসানে সন্ধ্যা সুন্দরীর সমাগম হইল। সমস্ত দিবসের আতপ-তাপ ভোগ করিয়া মধুময় ফুলগুলি পরিম্লান হইয়াছিল, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ কিরণে পুনরায় প্রফুল্লতা লাভ করিল।

কলিকাতায় মনোহর নামে জীবেন্দ্রের একজন বন্ধু প্রত্যহই সন্ধ্যার পর জীবেন্দ্রের নিকট আসিয়া থাকেন, আজও আসিলেন। জীবেন্দ্রের মুখ মলিন—নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত। তিনি সুনীতির ব্যারামের কথা জীবেন্দ্রের নিকট সব শুনিয়াছিলেন। অতএব জীবেন্দ্রের

ভাবান্তরের কারণ জানিতে অধিক সময় লাগিল না।

তখন তিনি জীবেন্দ্রকে রোদন হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া বলিলেন "কাঁদিলে কি হইবে ভাই! ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর।

জীবেন্দ্র। ঔষধে যখন কিছু হইতেছে না, তখন তাঁহার উপরেই নির্ভর করিয়া আছি। দেখি, তিনি কি করেন।

মনোহর। তোমার ভাল হইবে। ভক্তিভরে মঙ্গলময়কে ডাকিতে পারিলে অমঙ্গল আর কোথায় থাকে ভাই? জীবেন্দ্রও তাহা বুঝিলেন। ভগবানের নামে তাহার মনে বল হইল। তিনি গাইলেন :—

"তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার,
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার।
তুমিই আনন্দলোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপহরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীনজনার।"

গাহিতে গাহিতে জীবেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। জীবেন্দ্রকে কাঁদিতে দেখিয়া মনোহরের বড় আনন্দ হইল। তিনি দেখিলেন জীবেন্দ্রের হৃদয় ঈশ্বর-প্রেমে পরিপূর্ণ। বলিলেন "ভাই, তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি স্থিরচিত্তে তাঁহাকেই ডাক।

জীবেন্দ্র। তুমি আমাকে এইরূপই উপদেশ দিবে, ইহাতে আমার বড় উপকার হয়। কিন্তু আমি পাপী, তিনি কি পাপীর দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিবেন?

মনোহর। তিনি ধার্ম্মিককেও যেরূপ চক্ষে দেখেন, পাপীকেও সেইরূপ চক্ষে দেখেন। তিনি ক্ষমা না করিলে পাপীদের আর উদ্ধার কোথায়?

জীবেন্দ্র। তুমি বিবাহ কর নাই, চিরকাল সুপবিত্র কৌমার ধর্ম্ম পালন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। সন্ন্যাসীর ন্যায় সংসারে কোন বিষয়েই তোমার আসক্তি নাই। সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশীলনই তোমার জীবনের মুখ্য কাজ হইয়াছে। তুমি ঈশ্বরের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছ। আমি ঘোর অধমাধম। আমার উপায় কি হইবে ভাই!

মনোহর। তোমারই হোক আর আমারই হোক, উপায় অবশ্য আছে; কারণ ভগবান একটা না একটা উপায় উদ্ভাবন না করিয়া মানুষকে সংসার ক্ষেত্রে প্রেরণ করেন না। এ সংসারে তুমিও পাপী, আমিও পাপী। যদিও তাঁহার পবিত্র রাজ্যে ও পবিত্র সুশাসনে আমরা রক্ষিত হইতেছি, তথাপি আমরা ক্ষুদ্র-হৃদয় মানুষ। ঈশ্বরের উচ্চ আদেশ প্রতিপালন করিতে মানুষ চিরকাল অসমর্থ, অতএব অপরাধী। দেখ না সূর্য্য কেমন তাঁহার আদেশ মত উদয়াচলে অভ্যুদিত হন, সমস্ত দিবস কার্য্য ক্ষেত্রে সমুপস্থিত থাকিয়া পুনরায় অস্তাচলে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন, এক দিবসের তরেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। পৃথিবীও ভগবানের আদেশ প্রতিনিয়তই পালন করিয়া থাকে। চন্দ্র তারা মেঘ

বায়ুকেও দেখ। কে বলিতে পারে যে ইহাদের উপর দিয়া কত যুগ যুগান্তর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহারা কেমন নিয়মমত ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। অতএব ইহাদের মধ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায় না। আর মনুষ্যের মতি অতি ক্ষুদ্র, বাসনা অপরিসীম। দুর্ব্বলতা বশতঃ অল্প দুঃখেই অধিক কাতর হইয়া পড়ে, ভগবানের উপর বিশ্বাস হারায়। মিছামিছি ভগবানের মঙ্গলময় নামে অপবাদ ঘোষণা করে। অতএব মানব আপনা আপনি দুঃখের সাগরে নামিতে থাকে। যাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করে নাই, শোক দুঃখই তাহাদের উচিত প্রায়শ্চিত্ত।

জীবেন্দ্র। সকলই ত বুঝি ভাই, তবে কেন শোকে দুঃখে এত কাতর হইয়া পড়ি, তাহাত বুঝিতে পারি না।

মনোহর। তুমি কেন? সংসারের অধিকাংশ লোকেই এ কথা ভাল বুঝিতে পারে না, তাই জীবনকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে করে।

জীবেন্দ্র। আচ্ছা ভাই মানুষ তাঁহারই সন্তান, তবে কেন তাহারা এত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করে?

মনোহর। দুঃখ কি? দুঃখত একটা হৃদ্-রোগ বিশেষ। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ রোগের ভাল ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারেন। অতএব এ রোগ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট বড় একটা ঘেঁষিতে পারে না। সাধারণ লোকেই এ রোগে অধিক কাতর হইয়া থাকে।

জীবেন্দ্র। এ হৃদ্-রোগের ঔষধ কি ভাই?

মনোহর। এ রোগের ভাল ঔষধ আছে বটে, কিন্তু সে ঔষধ "নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস" বা "বসন্ত তিলকের বটিকা" নয়, সে ঔষধের নাম জ্ঞান, ধর্ম্ম, সহিষ্ণুতা। ধর্ম্ম ও জ্ঞান বলে বিজ্ঞগণ দুঃখকে তৃণবৎ দূরে সরাইয়া ফেলেন।

জীবেন্দ্র। তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, আমি যেন ঐরূপ শক্তি লাভ করি।

মনোহর। ভগবানের অনুগ্রহ তোমার উপর বর্ষিত হউক। তুমি তাঁহার বিমল প্রসাদ লাভ কর।

এই কথা বলিয়াই মনোহর জীবেন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মনোহরকে বিদায় দিয়া জীবেন্দ্র মনের আবেগে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাহির বারাণ্ডায় পদচারণ করিয়া বেড়াইলেন। তার পর রজনী যখন প্রভাত হয় হয়, তখন গি... শয্যাতলে শয়ন করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রাদেবী তাঁহাকে কোলে ক[illegible]য়া বসিলেন, কিন্তু সে নিদ্রা কুস্বপ্নময়। পরদিন বেলা ৮টার ট্রেণে জীবেন্দ্র বাড়ী রওনা হইলেন। (ক্রমশঃ)।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২রা সেপ্টেম্বর লর্ড কুর্জ্জন সিমলায় এক শিক্ষা-সমিতি আহ্বান করেন। ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরগণ ও শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরগণ তাহাতে আহূত হইয়া যান। বড় লাটের বক্তৃতা বড় সুন্দর হইয়াছে।

২। পূজার বন্ধে জষ্টিস হারিংটন ও বি এল গুপ্ত কলিকাতা হাইকোর্টের বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

৩। সিমলা পাহাড়ে অতি বৃষ্টি হেতু অনেক স্থান ধসিয়া গিয়াছে।

৪। রেঙ্গুণে ঝড় হইয়া অনেক লোহার ছাদ উড়িয়া গিয়াছে।

৫। শ্রীহট্ট অঞ্চলে ইতিমধ্যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা দিয়াছে, বোম্বাই অঞ্চলেও কম নয়।

৬। সুইজার্লণ্ডের জুরিচ নগরবাসী এক শিল্পী ক্ষুদ্রতম টেঁকঘড়ি করিয়াছেন, তাহার কাঁটা অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে হয়!

৭। ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহীশূর মহারাজ কলেজের ইতিহাসাধ্যা-‍ক নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কলিকাতায় জন্মসংখ্যা কম দেখা গিয়াছে। কলিকাতার স্ত্রী-সংখ্যার অল্পতা কি ইহার কারণ? গত সেন্সসে পুরুষ সংখ্যা ৫,৫৮,৬৯৭ এবং স্ত্রীলোক সংখ্যা ২,৮৪,৭৯০ মাত্র, ইহাদের মধ্যে বিবাহিতার সংখ্যা আরও কত কম! ইহার প্রতীকার আবশ্যক।

৯। ভাগলপুরের নবাব একটী মসজিদ নির্ম্মাণার্থ ২০,০০০ টাকা এবং কলিকাতা ও প্রদেশীয় বিক্টোরিয়া স্মৃতিফণ্ডে ১০ হাজার করিয়া ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১০। লর্ড কুর্জ্জন ২৮এ অক্টোবর সিমলা ত্যাগ করিয়া সিলচরে যাইবেন। তথা হইতে ব্রহ্ম ভ্রমণ করিয়া ২৬এ নবেম্বর মাণ্ডালে হইতে রেঙ্গুণে এবং তথা হইতে ২রা ডিসেম্বর কলিকাতায় ফিরিবেন। এই সময় লেডী কুর্জ্জন সন্তানদিগের সহিত বিলাত হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন।

১১। বেনারস সেণ্ট্রাল কলেজে ডাক্তার রিচার্ডসন নামক সুপণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছেন। ইনি স্বয়ং এক নূতন "ব্লো-পাইপ" যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন।

১২। লর্ড কুর্জ্জন চা-করদিগকে উপদেশ দিয়াছেন "সমুদায় ভারতবাসীকে চা খোর করিয়া কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন কর।" তিনি বলেন ২৫বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে কেরোসিন তৈল, বরফ, বিলাতী ছাতা এবং সিগারেটের ব্যবহার ছিল না, এখন লক্ষ লক্ষ লোক তাহা ব্যবহার করিয়া ব্যবসাদারদিগকে ধন ঢালিয়া দিতেছে। বড় লাট যেমন সূক্ষ্মদর্শী, এ দেশের লোক তেমনি বোকা!!

১৩। গত ২৭এ আগষ্ট ছোটলাট বাহাদুর ইউনিবার্সিটী ইনষ্টিটিউট, ২৯এ আগষ্ট সভাবাজার সাহিত্য সভা এবং ৫ই সেপ্টেম্বর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ছোটলাট দেশের সকল সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা।

১৪। সুবিখ্যাত ব্যায়ামচালক বাবু শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় পিতৃবিয়োগে না কি বৈরাগী হইয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ক্ষাত্রবল অপেক্ষা ব্রহ্মবলই শ্রেষ্ঠ।

১৫। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ম্যাকিনলীর ঘাতক হস্তে মৃত্যু হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। নীহার—কাঁথি হইতে নীহার নামে পাক্ষিক পত্রের অভ্যুদয় দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। ইহার নমুনা আশাজনক।

২। The English Works of Raja Ram Mohun Roy, বাবু শ্রীকান্ত রায় দ্বারা প্রচারিত এবং ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এ; বি এল সর্ব্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজি গ্রন্থাবলী প্রচার করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার মুদ্রাঙ্কিত প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াতে শ্রীকান্ত বাবু বহুব্যয়ে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ সুন্দররূপে মুদ্রিত করিয়াছেন। রাজার গ্রন্থাবলী তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মেধা, ধর্ম্মজ্ঞান, স্বদেশহিতৈষিতাদি গুণের জলন্ত নিদর্শন। বিদ্যার্থী ধর্ম্মার্থী ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা অবশ্য পাঠ্য। রামমোহন রায় যথার্থই এক নবযুগের পত্তন করিয়াছেন, তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিলে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের আশা করা যায়।

৩। সুরুচির কুটীর—৺ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। এই গ্রন্থখানিতে একটী কল্পিত আদর্শ-নারীর চিত্র সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সামান্য অবস্থার স্ত্রীলোক যেরূপ প্রণালীতে চলিলে সুখে সচ্ছন্দে ঘর সংসার করিয়া সাধ্যমত অপরেরও উপকার করিতে পারেন, এই পুস্তকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে ন্যাসনাল ইণ্ডিয়ান সভা মেরী কার্পেণ্টার পারিতোষিক দিয়া এই পুস্তক গ্রহণ করেন, ইহা নারীদিগের পাঠ্য ও গার্হস্থ্য পুস্তকালয়ে রাখিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

৪। সচিত্র কোমল পাঠ, নিটিবুক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত, মূল্য একআনা। ইহা প্রথম ভাগ শিশু শিক্ষার স্থানীয়। পাঠ সকল সুন্দররূপে বিন্যস্ত হইয়াছে এবং অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি দ্বারা পুস্তকখানি সুসজ্জিত। ইতি

মধ্যে ইহার তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে পুস্তকখানি কেমন আদৃত হইয়াছে। ইহার আরও বহুল প্রচার দেখিলে আমরা সুখী হইব।

বামারচনা।

শরতে।

এই ত আবার ফিরে দেখিতে দেখিতে,
সুখদ শরৎ ঋতু আসিল ধরায় ;
উদিল শারদ-শশী তারাগণ সাথে,
মেঘমুক্ত নিরমল নীলাকাশ গায়। ১

নিবিড় নীরদ রাশি ভেদিয়া আবার,
শত রশ্মি প্রকাশিয়ে উঠে দিনমণি ;
সুদূর অম্বরে পুনঃ হেরি দিবাকর,
নির্ম্মল সলিলে হাসে ফুল্ল কমলিনী। ২

আবার ছাইল ধরা শুভ্র জোছনায়,
শশাঙ্কে উদিত দেখি নির্ম্মল অম্বরে,
কুমুদিনী হাস্য মুখে উর্দ্ধপানে চায়,
দিবা ভ্রমে বিহঙ্গম কলরব করে। ৩

দিবসেতে দিনমণি শোভে নীলাম্বরে,
নিশিতে নির্ম্মল শশী নভে শোভা পায় ;
চারিদিকে তারাগণ শোভে থরে থরে,
শরতে আবার শোভা হয়েছে ধরায়। ৪

সানন্দে প্রকৃতি রাণী সাজিল আবার,
করবী কলিকা আদি কুসুম ভূষণে ;
সেফালিকা ঝুরু ঝুরু পড়ে অনিবার,
(যেন) আপনি দিতেছে ডালি প্রকৃতি চরণে। ৫

সেই আষাঢ়ের শেষে চলিয়া যে গেল,
বড় সাধনের ধন 'সুনীল' আমার ;
ঘুরিয়া শরৎ ঋতু চারিবার এল,
মোর সে নয়ন মণি আসিল না আর !!! ৬

শ্রীমতী নী—

স্বর্গগতা মোক্ষদাসুন্দরীর বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস।

কে হরিল কোথা গেল হরি হরি হরি !
সতী সাধ্বী পতিব্রতা, অমরার ফুল-লতা,
জগতে পুণ্যের-জ্যোতি মোক্ষদা সুন্দরী !১

এ অকালে কে হরিল নবীন ব্রততী ?
কার হেন অভিশাপে, দগ্ধ হই পরিতাপে,
সে পুণ্য-প্রতিমা স্মরি গাই শোক-গীতি ।২

কে জানে মহিমা তব মোক্ষদা সুন্দরী !
পুত-[illegible]র প্রতিকৃতি, সৌন্দর্য্যের শ্বেত-সুঁদী,
মহীয়সী মহাশয়া তুমি দেব-নারী,
কে তোমা হরিয়া নিল হরি হরি হরি !৩

কিনা তুমি সহিয়াছ সহিষ্ণুতা গুণে—
গুরুজন অত্যাচার, শতবার কোটিবার,
কি শোক না সহিয়াছ কোমল পরাণে !৪

কোমল কুসুম-সম কুমার কুমারী
কত যে কালের কোলে,
এ বয়সে দেছ ফেলে,
তথাপিত ছিলে স্থির পুণ্যবতী নারী ।৫

অবশেষে কি করিল নিদারুণ বিধি ?
সোণার কুসুম-সম, নিরুপম অনুপম
পাগল হইল পুত্র হৃদয়ের নিধি ।৬

সোণার শশাঙ্ক চারু প্রথম সন্তান,

সে যে উপযুক্ত ছেলে
পুত্র-বধূ পাবে কোলে,
সুখের আশায় ছাই, দগ্ধ হোল প্রাণ।৭
আঘাতে আঘাতে ক্ষত হইল হৃদয়,
শেষকালে একেবারে, সমূলে ভাঙ্গিয়া পড়ে,
নিবিল জীবন দীপ, লভিলে চিন্ময়।৮
কায়মনে পূজিয়াছ স্বামীর চরণ
ননদ দেবর গণে, তুষিয়াছ প্রাণপণে,
দাস দাসী লোক জনে করেছ যতন।৯
গুরুজনে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে সরলা,
তব সম শুদ্ধ-মতি রমণী বিরল অতি,
ছিলনা অন্তরে তব কোন কুট ছলা।১০
দেখ সতী প্রাণপতি যে ছিল তোমার
যে আগে তোমার তরে,
প্রাণ দিত বুক চিরে,
সেই আজি করিতেছে বিবাহ আবার!!১১
কাল তুমি ছিলে যাঁর হৃদয়ের ধন,
আজ তুমি গেছ মরে,
সে পুনঃ বিবাহ করে,
হায়রে কি হলাহল সংসার বিষম!১২
সে নাকি প্রাণের প্রাণ প্রাণকান্ত মণি,
সে নাকি হৃদণ্ডে ভুলে,
অন্যেরে প্রেয়সী বলে,
হায়রে পতির প্রেম ক্ষণিক এমনি!১৩
সংসারে এমনি যদি কুৎসিত নিয়ম,
তবে সতী পুণ্যবতী, পেয়ে গেলে অব্যাহতি,
এমন পতির প্রেমে কিবা প্রয়োজন?১৪
তব পুণ্যময়ী স্মৃতি লইয়া আমরা
কতবার খেদ করি কাঁদিব জীবন ভরি,
ভাবিতে ভাবিতে হব ভাবে আত্ম-হারা।১৫
সংসার-নরক-কূপে লভি অব্যাহতি,
যাও সতী স্বর্গপুরে, স্বরগ-কুসুম-ঘরে,
মহা আলোকের রাজ্যে দেবী পুণ্যবতী।১৬

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

বিভুবালার স্মৃতি।

ছোট মামীর শোকগাথা।*

কেন মা এমন আজি মলিন-বদনে
রহিয়াছ শয্যাপরে মুদিত-নয়নে?
নিস্পন্দ অসাড় কায়,
শ্বাস নাহি নাসিকায়,
না চাহ নয়ন মেলি ভ্রাতা ভগ্নীগণে?১
উঠ মা আলস্য ত্যজি, দেখ একবার
তোমারে হারায়ে তারা
হয়েছে আপনা-হারা,
উঠিয়া সান্ত্বনা দাও হৃদে সবাকার।২
ধরিয়াছে যদবধি ব্যাধি দুর্নিবার,
তদবধি সুখে নিদ্রা যাও নাই আর,
হয়ে তাই অবসন্ন,
হয়েছ কি নিদ্রাচ্ছন্ন,
আজি কি হয়েছে দূর যন্ত্রণা অপার?৩
ব্যাধি-ক্লিষ্ট ক্ষীণ স্বরে বলিতে সদাই
"ছোটমামী কাছে এলে দেহে প্রাণ পাই।
মাতুলানী নহ তুমি,
মাতৃসমা দেখি আমি,

* ছোট মামী ও মামা মাতা পিতার ন্যায় বিভুবালার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। আশ্চর্য্য, শয্যাগত রোগী মৃত্যুর পূর্ব্বদিন এই ছোট মামীকে ঠেস দিয়া বসিয়া যেন রোগমুক্ত হইয়াছে, এইরূপ সচ্ছলভাবে অনেকক্ষণ কাটাইয়া বড়ই আরাম বোধ করিয়াছিল। বা, বো, স।

অঙ্কেতে মস্তক রাখি থাকিবারে চাই।"৪

উঠ ওমা বিভুবালা! উঠ একবার,
দেখ চেয়ে ছোট মামী ডাকিছে তোমার;
এস লই অঙ্কোপর,
ললাটে বুলাই কর,
তালবৃন্ত সঞ্চালন করি অনিবার। ৫

এতক্ষণে গেল ভ্রম, বুঝিনু নিশ্চয়—
এ নিদ্রা অনন্ত নিদ্রা ভাঙ্গিবার নয়!
আজি ফুরাইল সব,
আমাদের পরাভব,
মৃত্যুর(ই) হইল হায়! অবশেষে জয়। ৬

ভাবিতাম যোগ্য পাত্রে পরিণীতা হয়ে
আনন্দে যাইবে তুমি শ্বশুর-আলয়ে;
না মিটিতে কোন সাধ
বিধাতা সাধিল বাদ,
কোথা যাও শেলাঘাত করিয়া হৃদয়ে ?৭

সুকোমল শয্যোপরি ব্যথা লাগে যায়—
সে দেহ তোমার আজি কোথা লয়ে যায়?
পাষাণে বাঁধিয়া মন
চিতানলে বিসর্জ্জন
কেমনে আত্মীয়গণ করিবে গো তায় ?৮

তোমারে বিদায় দিয়ে চিরদিন তরে
কি লয়ে রহিব মোরা এই শূন্য ঘরে ?
তোমারে বিদায় দিয়ে
উষা * রবে কি লইয়ে ?
সুদীর্ঘ দিবস তার কাটিবে কি করে ?৯

ক্লেশকর সুদুস্তর পরীক্ষাসাগর,
বিফল-প্রয়াস যাহে যুবক-নিকর,
হাসিতে হাসিতে পার
হয়ে ছিলে দুইবার
বালিকা বয়সে যাহা অদৃষ্ট-গোচর !১০

* উষাপ্রভা—কনিষ্ঠা ভগিনী।

অধ্যয়নে অনুরাগ সতত প্রবল,
অক্লান্ত আয়াস, অধ্যবসায় অটল,
গার্হস্থ্য বিপদ যত,
রোগ শোক তাপ কত,
পারে নাই করিবারে তোমারে চঞ্চল।১১

তোমার স্নেহের ধন পুস্তকনিকর,
তুমি বিনা তাহাদের কে করে আদর ?
শূন্যময় পাঠাগার,
করে আজি হাহাকার,
অমার্জ্জিত গ্রন্থচয় ধূলায় ধূসর।১২

ধ্যানমগ্ন যোগী যথা রহে যোগাসনে,
কে রহিবে পাঠে মগ্ন একান্তে নির্জ্জনে ?
আসিলে স্কুলের গাড়ী,
কে উঠিবে তাড়াতাড়ী,
বিদ্যা-জ্যোতি-বিমণ্ডিত প্রফুল্ল আননে ?

দিবা-অবসান-কালে ত্যজি বিদ্যালয়
কে আসিবে গৃহে ফিরি সানন্দ-হৃদয় ?
এলায়িত কেশপাশ,
পরি চারু শুভ্রবাস
করে লয়ে সযতনে পাঠ্যগ্রন্থচয়।১৪

শিখিলে সামান্য বিদ্যা বঙ্গ-বালাচয়
নিজেরে বিদুষী ভাবি গর্ব্বিত-হৃদয়,
এত বিদ্যা শিখি বিভু!
গরিমা ছিল না কভু,
কি মধুর সুশীলতা সারল্য বিনয়!১৫

বারেক যে হেরিয়াছে তব ব্যবহার,
ভুলিতে শকতি কভু নাহি হবে তার;
বিদ্যা জ্ঞান সরলতা
একাধারে বিরাজিতা,
দেখি নাই হেন কভু দেখিব না আর।১৬

মানবের মনে হায়! আশার লহরী
সতত বিহার করে কত রূপ ধরি,
বড় মনে ছিল আশ,
অনরেতে বি এ পাশ
হইয়া আসিবে তুমি শিরোদেশে পরি।১৭

যশের মুকুট চারু শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়,
আনন্দসাগরে মগ্ন হইবে হৃদয়;
কিন্তু একি অকস্মাৎ
বিনা মেঘে বজ্রপাত,
অঙ্কুরিত আশা তরু পাইল বিলয়।২৮

কি দুর্জ্জয় ব্যাধি আসি হইল উদিত!
চিরতরে সুখ শান্তি হ'ল অন্তর্হিত!
দুঃসহ বিষম জর
জ্বালাময় কলেবর,
মস্তকে অসহ্য জ্বালা নেত্র নিমীলিত।১৯

দেখাইলে যেই দৃশ্য রোগ-শয্যাপরে,
মানসে অঙ্কিত তাহা রবে চিরতরে;
কি অদ্ভুত সহ্য শক্তি!
ভবেশে অচলাভক্তি!
কি পবিত্র দেব-ভাব হৃদয়-কন্দরে!!২০

সহি যে যাতনা লোক হয় জ্ঞানহীন,
দেখি নাই রুক্ষভাব তাহে একদিন;
দুঃসহ ব্যাধির জ্বালা
সহ্য করি বিভুবালা!
রহিতে অন্তরে সদা বিভুপদে লীন।২১

সুখে দুঃখে অবিচল একান্ত বিশ্বাস,
মুখে দয়াময় নাম যাবত নিঃশ্বাস;
জপিতে জপিতে নাম,
গেলে চলি শান্তিধাম,
নাহি যথা রোগ শোক দুঃখ ক্লেশ ত্রাস।২২

যাও তবে বিভুবালা! বিভু-সন্নিধান,
অনন্ত অক্ষয় সুখপূর্ণ যেই স্থান;
দূরে যাবে শ্রান্তি ক্লান্তি,
পাইবে অপার শান্তি
বিশ্বজননীর ক্রোড়ে হইয়া শয়ান।২৩

স্বর্গগতা স্নেহময়ী জননী তোমার
সযতনে ক্রোড়ে তুলি ল'বেন আবার;
আসি দেববালাগণ
করি তোমা আবাহন
আনন্দে খুলিয়া দিবে ত্রিদিবের দ্বার।২৪

ভাবিলে এ কথা মনে শোকে শান্তি পাই,
চিরসুখে থাক তুমি এই বর চাই।
জীবলীলা সাঙ্গ হবে,
আবার মিলিব সবে,
এর চেয়ে সুখকর আশা আর নাই।২৫

সেই প্রিয় সম্বোধন—সেই কণ্ঠস্বর
রহিয়াছে পূর্ণ করি শ্রবণ-বিবর;
সেই মুখ—সেই হাসি
সতত বেড়ায় ভাসি
নয়নের কাছে কাছে সহে দূরতর।২৬

চিত্তপটে চিত্র তব রবে চিরাঙ্কিত,
গুণরাশি রবে সদা হৃদয়ে মুদ্রিত;
পবিত্রা দেবীর বেশে
দেখা দিও কাছে এসে,
অন্তিম সময় যবে হবে উপনীত।২৭

সুপুত্র বংশের ভূষা বলে সর্ব্বজন,
কোথা মিলে তব সম তনয়া-রতন?
শতপুত্রে সুখ তত
নহে কভু, হয় যত
লভিলে সুকন্যা এক তোমার মতন।২৮

বড়দিদীর বিলাপ। *

১

পিতঃ!
আমাদের বিভুবালা কেন চলি যায়?
স্বরগের পারিজাত,
অনাবিল অনাঘ্রাত,
এখনো স্বরগ-গন্ধ মাখা ওর গায়!
সাধের জীবন ওর,
কেবল যামিনী ভোর,
এখনো দেখেনি চেয়ে কি আছে কোথায়?
এখনি স্নেহের বোন কেন চলি যায়?

২

পিতঃ!
আমাদের সোণামুখী কেন চলি যায়?
হিংসা দ্বেষ কিম্বা রাগ
ও বুকে কাটেনি দাগ,
জানেনি ধরায় কিছু—নয়ে কিবা চায়।
শুধু ভালবাসিয়াছে,
সবে কাছে টানিয়াছে,
আপনা ঢালিয়া দেছে স্নেহ মমতায়,
তবে কেন বিভুবালা তাড়াতাড়ি যায়?

৩

সকলে যে ডাকে, বিভু, ফিরে আয় আয়।
ডাকে বাড়ী ডাকে ঘর,
ডাকে সে আত্মীয় পর,
স্নেহ, প্রীতি, যশঃ, পুণ্য ডাকে উভরায়—
কেন শুনিলি না বোন।
তোর এ কেমন মন,
কেন ও কোমল হিয়া গ'লেনা দয়ায়?
শত সুখ ডাকে তোরে ফিরে ঘরে আয়।

৪

কে করেছে অনাদর কে দিয়েছে গালি,
কোন্ অভিমানে দিদি,
ব্যথিত সরল হৃদি,
তাই তুমি চলে যাও, বুক করে খালি?
তুমি সে সোণার মেয়ে,
পবিত্রা পুণ্যের চেয়ে,
চির আদরের ধন, যতনের ডালি,
তুমি কেন গেলে আজি, এ আগুন জ্বালি?

৫

দারুণ রোগের জ্বালা তবু মুখে হাসি—
এত যে বিষম ক্লান্তি,
তবু বুকে কত শান্তি,
কার এ অমৃত-মাখা আশীর্ব্বাদ রাশি?
কার স্নেহ নিরমল,
ও প্রাণে দিয়েছে বল,
সে অজানা কথা কেবা কহিবে প্রকাশি?
এখনো ভাসিছে চখে, সে মধুর হাসি।

৬

কি দারুণ রোগ আসি গ্রাসিল তোমায়—
শশী যেন রাহু গ্রাসে,
কৌমুদী ফুরায়ে আসে,
কালি-মাখা চন্দ্রকলা, কি দেখিনু হায়!
দেখি ফেটে যায় বুক,
বিবর্ণ ও সোণা মুখ,
কেবলি অসহ্য "জ্বালা" নাহিরে জুড়ায়।
কি নিঠুর রোগ আহা! গ্রাসিল তোমায়!

* এই বিদী বহুদূর হইতে রোগীকে দেখিতে আসিয়া কয়েক দিন সেবা শুশ্রূষা করিয়া গিয়াছেন।
বো, স।

৭

তবে
নাও মা! স্নেহের কোলে অঞ্চলের ধন,
তোমারি অমিয় ঢালা,
মা! তোমার বিভুবালা,
জননী আছেন বসি, দিবি আলো করি।
রাখিতে নারিলা কেহ—
বাবার করুণা স্নেহ,
ভাই বোনদের প্রীতি, মমতা, যতন,
নাও মা, তোমারি কোলে তোমারি রতন।

৮

তোমারে ছেড়ে মা, বিভু নারিল থাকিতে,
বিধির করুণ দান,
বিদ্যা, বুদ্ধি, যশঃ মান,
ওর যেন ভার বোঝা চাহে না বহিতে।
তোমারি মমতা স্ফূর্ত্তি,
তোমারি সে দেবীমূর্ত্তি,
তাই বিনা কিছু যেন পারে না চাহিতে।
নাও মা, আদুরে মেয়ে আদরে তুষিতে।

৯

দাও আজি দিব্য দৃষ্টি, মা জগদীশ্বরি!
একবার দেখি চেয়ে,
কোলে সোহাগের মেয়ে,
চলিল তোমারি কোলে না মানি বারণ!
একবার দেখি চেয়ে,
স্নেহময়ী মা'রে পেয়ে,
বিভুবালা সব জ্বালা ভুলেছে আমরি!
একবার দেখি চেয়ে,
তোমার করুণা পেয়ে,
পেয়েছে অনন্ত শান্তি দ্যুলোক উপরি।
দেখি সেই পরলোক
ভুলি এ দারুণ শোক,
তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা শিখি শুভঙ্করি!
দাও মা, তাপিত বুকে শান্তি সুধা ভরি।

একজন "দিদি।"

সহৃদয়া বামাবোধিনীর লেখিকার উপহার।

অস্ফুট মুকুল।

জীবনের উষালোকে মধুর প্রভাতে,
ফুটিয়া উঠিতেছিল, সুরভি মুকুল।
বিতরি সুবাস মধু সারা ধরা পথে
ছড়ায়ে সৌন্দর্য্য বিভা অমূল্য অতুল।
সহসা পশিল কীট অস্ফুট মুকুলে,
জীর্ণ হল দল রাশি, নাহি শোভা আর,
অতি শ্রান্ত চেয়ে যেন আছে মোহ ভুলে
লভিতে বিশ্রাম শান্তি, তলে ঝরিবার।
ক্ষুদ্র ফুল জীবনের মৃদু উষালোকে
বৃন্তচ্যুত, ঘুমাইল মরণ শয়নে,
আবার উঠিবে জাগি সে অমর লোকে।
প্রেমময় জগদীশ স্নেহের উদ্যানে
রাখিবেন ফুটাইয়া, তাহারে যতনে।

শ্রীস—দেবী।

* স্থানাভাবে বিভুবালার একটী সঙ্গিনী ভগিনীর উপহার এবার প্রকাশিত হইতে পারিল না।

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৯ বর্ষ। ৪৪৩ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩০৮। ডিসেম্বর, ১৯০১। | ৭ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজভ্রমণ—কর্ণওয়ালের ডিউক **যুবরাজ** সস্ত্রীক কানাডা ভ্রমণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বিলাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। **ইহাঁর** ভ্রমণের ফল ইহাঁর নিজের এবং ব্রিটিষ সাম্রাজ্যবাসী সকলের কল্যাণের কারণ হউক।

বঙ্গের লোকসংখ্যা—বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ ৩৯০৯ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পেনেলের পদচ্যুতি—নোয়াখালির জজ পেনেল ষ্টেট সেক্রেটারীর আদেশে পদচ্যুত হইয়াছেন। লোকের বিশ্বাস কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহাঁর গুণের বিচার না করিয়া সামান্য সামান্য দোষ ধরিয়া এই গুরু দণ্ড দিয়াছেন। পেনেলের জন্য এদেশবাসিগণের আক্ষেপ অরণ্যে রোদন।

কনগ্রেস কমিটী-সংরক্ষণ—অর্থাভাবে বিলাতের কনগ্রেস কমিটী বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। এলাহাবাদের কনগ্রেস ইহার জন্য বার্ষিক ২৫০০০টাকা দিবার এবং "ইণ্ডিয়া" নামক ইংরাজী পত্রিকাকে 'মাসিক' করিবার প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন।

আমীরের মৃত্যু—গত ৩রা অক্টোবর কাবুলের আমীর আবদুল রহমনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ২১ বৎসর আফগানিস্থানে রাজত্ব করিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হবিব-উল্লা সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন।

পত্রিকালেখিকা সভা—বিলাতে "Society of Women Journalists" নামে এক সভা আছে, তাহার সভ্য হইবার বার্ষিক দাতব্য এক গিনি। ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের

হাজার হাজার পত্রিকা-সম্পাদিকা ও লেখিকা আছেন, তাহাদের স্বার্থরক্ষণ ও উন্নতি সাধন এই সভার উদ্দেশ্য।

দান — গোলোকপুরের জমিদার কুমার উপেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী আলেকজাণ্ডার বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থ ৭০০০ টাকা ও ময়মনসিংহ সিটিকলেজ ফণ্ডে ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। মুক্তাগাছার জমিদার বাবু জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ময়মনসিংহ সিটিকলেজ ফণ্ডে ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট—উক্ত রাজ্যের সভাপতি মৃত ম্যাককেন্‌লির স্থানে সহকারী সভাপতি রুসভেল্ট অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইনি খুব উপযুক্ত লোক।

রামমোহন-মহোৎসব—রাজা রামমোহন রায়ের ৬৭ বার্ষিক মৃত্যুদিন স্মরণার্থে কলিকাতা সিটীকলেজে এক বিরাট সভা হয়, বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি ছিলেন। সভাস্থলে ৩০০০ হাজারের অধিক লোকের সমাগম হয়। লোকের ভিড়ের জন্য কলেজ-বাটীর অতিরিক্ত দুইটী স্থানেও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। কটক, ময়মনসিংহ, সিলং, শ্রীহট্ট, ঢাকা, বরিশাল, বাঁকিপুর এলাহাবাদ প্রভৃতি অনেক স্থানে স্মরণার্থ সভার মহাসমারোহ হইয়াছে এবং অনেক বিদ্বান্ ও বিদুষীগণ রাজার গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীহট্টে শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী চৌধুরী এবং সিলঙে শ্রীমতী সরলা দেবীর বাগ্মিতায় শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়াছিল।

সমাজসংস্কার—মহীশূরে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এখন তত্রত্য বিবাহিতা বিধবা ও তাঁহার সন্তানগণ রাজবিধি অনুসারে বৈধপত্নী ও বৈধ সন্তানদিগের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

উচ্চপদে দেশীয় শিক্ষক—বাবু হরিনাথ দে নামক যে যুবক গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার ট্রাইপো পরীক্ষায় ইয়ুরোপীয় ছাত্রদিগকে নিম্নে ফেলিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে ইম্পিরিয়াল এডুকেশন সারভিসে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মাসিক বেতন বর্ষে বর্ষে ৫০ টাকা করিয়া বাড়িবে।

বাঙ্গালীছাত্রের পদ-গৌরব—বাবু রমাকান্ত রায় জাপানের কিনদিন কয়লার খনিতে আসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন।

বঙ্গীয় হিন্দুমহিলার পরিচ্ছদ।

আপনারা প্রবন্ধের নাম দেখিয়া ভয় পাইবেন না। মহিলা-পরিচ্ছদ-তত্ত্ব অদ্য আমার লেখ্য বিষয় নয় এবং সেরূপ কঠিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাও আমার

সাধ্যাতীত। তবে আমার মনে হয় যে, হিন্দুমহিলার বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণ করিবার পোষাকের একটু সংস্কার আবশ্যক এবং সেইজন্য আজ লেখনী-ধারণ। হিন্দু-মহিলার বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণ শুনিয়াই অনেকে চমকিয়া উঠিবেন। যাঁহারা পুরাতন তন্ত্রের লোক, তাঁহারা বলিবেন হিন্দুমহিলাত আর মেম সাহেব নন বা ব্রাহ্মিকা নন যে বেড়াইতে বাহির হইবেন এবং হিন্দুসমাজ যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয় —তাহার বিশুদ্ধতা নষ্ট করিবার ইচ্ছা যদি না থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালী হিন্দু স্ত্রীলোকের হাওয়া খাইবার কথা উঠিতেই পারে না। আবার যাঁহারা নব্যভাবাপন্ন স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাঁহারা কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিবেন "পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী," যাঁহারা মান্ধাতার আমল হইতে অবগুণ্ঠনবতী ও কারারুদ্ধা, তাঁহাদের আবার বেড়ান? কিন্তু একটু কথা আছে।

আজকাল মধুপুর বৈদ্যনাথ অঞ্চলে বেড়াইতে যাওয়া বাঙ্গালী বাবুদের একটা ঢং হইয়াছে। শরীরের জন্যই হউক বা বাবুয়ানার জন্যই হউক, পূজার সময় অবস্থায় কুলাক আর নাই কুলাক, অনেকে আর দেশে থাকেন না বা বাড়ী যান না। যাঁহারা হাওয়া খাইতে যান, তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে একলা না যাইয়া পরিবার সঙ্গে করিয়া গিয়া থাকেন। আমিও এই রঙ্গের একজন রঙ্গী। দৃষ্টান্তের দোষ কত খারাপ, তাহা আর বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। যাঁহারা পরিবার লইয়া যান, প্রথম প্রথম তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জন আপনাদের পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে মধুপুর বৈদ্যনাথের বিমল বায়ু সেবন করাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। আজ কাল দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহাদের দেখাদেখি প্রায় সকলেই নিজ-বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে বায়ুসেবনার্থে পাঠান। সকালে বিকালে, বিশেষতঃ বিকালে যে দিকে চাও দেখিবে স্ত্রীলোকেরা দলে দলে বিচরণার্থে বাহির হইয়াছে। ইহারা সব খাঁটি হিন্দু, ইহাদের মধ্যে মেম সাহেব বা ব্রাহ্মিকার আমেজ মাত্র নাই। ইহাদিগকে বেড়াইতে দেখিয়া দুঃখও হয়, সুখও হয়। দুঃখ হয় "হিন্দুর পরদা ফাঁক" দেখিয়া। হিন্দুমহিলা আর নিছক অন্তঃ-পুরচারিণী নন, তাঁর ঘোমটারও আর সে জাঁক নাই। সুখ হয়—বস্তুতঃ কি তবে হিন্দু সমাজেরও ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতেছে এই ভাবিয়া; "না দেখিতে দাও অবনী আকাশ" এ ভাব কি সত্যসত্যই তিরোহিত হইতে চলিল, ইংরাজী শিক্ষার ফল কি সত্যসত্যই ফলিতে চলিল এই ভাবিয়া।

যাহা হউক সুখ দুঃখের কথা এখন থাক। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, আপত্তিই থাক আর সম্মতিই থাক, মধু-পুর বৈদ্যনাথ অঞ্চলে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আজ ভ্রাম্যমাণা। আজ কাল বিকালবেলা দল বাঁধিয়া না বেড়াইলে তাঁহাদের ক্ষুধা হয় না, মনটা কেমন কেমন করে।

যখন বাহির হইতেই হইল, তখন পোষাকের প্রতি কিছু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। পোষাকের প্রতি যে একেবারে দৃষ্টি নাই, তাহা বলি না। যাঁহারা বেড়াইতে যান, তাঁহাদের পোষাকের কিঞ্চিৎ পারিপাট্য লক্ষিত হয়। তাঁহারা পরিষ্কার শাটী, সেমিজ ও জ্যাকেট বা বডিস পরিধান করেন এবং অল্প শীত বোধ হইলে আলোয়ান বা র‍্যাপারও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্ম বা দেশীয় খৃষ্টান মহিলার পোষাকে যেরূপ পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, হিন্দু-স্ত্রীলোকের পোষাকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। একেত ইঁহাদের ভ্রমণ করা অভ্যাস নাই, বাহির হইতেই কেমন বাধো বাধো ঠেকে, তাহার উপর শাটী ও র‍্যাপার লইয়া অনেক সময় ইঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। এদিকে এই ব্যাপার, তাহার উপর অবগুণ্ঠনত আছেই। আমার বিবেচনায় বেড়াইতে হইলে ঘোমটার পরিবর্ত্তে ওড়না ব্যবহার করা উচিত এবং শাটী কতকটা ব্রাহ্মিকাদের ধরণে পরাও দরকার। তাহাহইলে কোমরবন্ধ ব্যবহার করা চলে ও কাপড় লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয় না। পোষাক কতকটা স্বচ্ছন্দ ও সুখদ না হইলে বেড়াইবার পক্ষে বড় অসুবিধা হয়। হিন্দুমহিলার বেড়াইবার পোষাক অনেকটা সভ্য হইলেও অসুন্দর। আর এক কথা, খালি পায়ে বেড়ান যে কি আরামের, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে কেহ বুঝিতে পারে না। অনেক স্ত্রীলোকের মুখে শুনিয়াছি খালি পায়ে বেড়াইতে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হয়, বিশেষতঃ মধুপুরাদি কঙ্কর ও প্রস্তরময় স্থানে। তার উপর যখন পথ ধূলিময় হয় এবং ধূলা ঘোমটাকে অবমাননা করিয়া তাহার উপর পর্য্যন্তও উঠে, তখনকার বাহার ও আরাম যে দেখিয়াছে বা ভোগ করিয়াছে সে ব্যতীত অন্যের উপলব্ধি করা অসম্ভব। একবার হিন্দুমহিলাদের বেড়াইবার ঢং দেখিয়া এক মেম তাঁর সাহেবের দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাসিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিয়াছিলেন "দেখ, বাঙ্গালী মহিলারা ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন!" যদি বেড়াইতেই হয়, তাহা হইলে এরূপ ভাবে ও এমন পরিচ্ছদে বেড়ান উচিত যে লোকের হাস্যভাজন না হইতে হয়। সেইজন্য আমি বলি উপরে বাঙ্গালী হিন্দুমহিলার ভ্রমণপরিচ্ছদের যে পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ছাড়া আরও একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক—তাহা হইতেছে জুতা ও মোজা। স্বাস্থ্যের দিক্ হইতেই দেখ, সৌন্দর্য্যের দিক্ হইতেই দেখ বা সভ্যতার দিক্ হইতেই দেখ ভ্রমণ করিতে হইলে স্ত্রীলোকদের জুতা মোজা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

অনেকে বলিবেন পরিচ্ছদের এরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বিবিয়ানা আসিয়া পড়িবে। প্রাতঃকালিক বা বৈকালিক ভ্রমণ ত আমাদের স্ত্রীলোকদের পক্ষে বিবিয়ানা। দশ বৎসর পূর্ব্বে উহা ছিল

না এবং বোধ হয় পুরাকালে দময়ন্তীর পরই উহা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু বস্তুতঃ বেড়ান অনেকটা স্বাস্থ্যের জন্য, বিবিয়ানার জন্য নয়, এবং তাহা হইলে জুতা মোজা পরিয়া একটু সুন্দর ও সুবিধাজনক পোষাকে বিভূষিত হইয়া বেড়ান বিবিয়ানা নয়। যে কাজ করিতে হইবে, তাহা যত সুরুচির সহিত করা যায়, ততই ভাল।

অনেক হিন্দু বলেন, ব্রাহ্মসমাজের বিলাসিতা হিন্দুসমাজে যত কম প্রবেশ করে, ততই ভাল। তাঁদের মতে ব্রাহ্ম মহিলাদের মধ্যে বিলাসিতা আজকাল খুব প্রবল। তাঁদের কুন্তলীন ও দেলখোস, অটো-ডিরোজ ও ওডিকলোন, পাউডার ও কথ্‌গেটের সাবান কিনিতে কিনিতে ব্রাহ্মভ্রাতারা নাজেহাল হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মমহিলারা নাকি যে পোষাক একবার পরিয়াছেন, সে পোষাক পরিয়া বারান্তর বাহির হইতে বিবিদের ন্যায় কুণ্ঠিত হন; পরিত্যক্ত শাটী, জ্যাকেট, বডিস ও বনেট তাঁদের ঘরে নাকি স্তূপীকৃত হইতেছে এবং দরজী ও কাপড়ওয়ালার হিসাবের জ্বালায় অনেক ব্রাহ্মপরিবারের কর্ত্তাকে নাকি সংসার পরিত্যাগ করিয়া ফকির হইবার কল্পনা করিতে হইতেছে। আমি খাঁটি হিন্দু, আবশ্যক না হইলে কোন হিন্দুরীতির অবমাননা করি না, ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। ব্রাহ্মগৃহে আজকাল কিরূপ গোলযোগ উপস্থিত তাহার সংবাদ আমার কাছে পৌছায় না। তবে ব্রাহ্ম-গৃহে যে বিলাসিতার স্রোত খরবেগে প্রবাহিত, তাহা বিশ্বাস করিতে আমার ইচ্ছা হয় না, এবং আশা করি, যাঁরা এইরূপ রটনা করিয়া বেড়ান, তাঁরা মিথ্যা-রটনাকারী শত্রু। যদি ব্রাহ্মসমাজের এই অপবাদ সত্য হয়, তাহাতে হিন্দু-সমাজের আসিবে যাইবে কি? পরিচ্ছন্নতা, পরিচ্ছদ-পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য এবং বিলাসিতা এক বস্তু নয়। পোষাক সম্বন্ধে বিলাসিতা, কাহাকে বলি? যদি পোষকের সংখ্যা এত বেশী হয় যে, অধিকাংশ যথোপযুক্ত ব্যবহার করিবার সময় পাওয়া যায় না, বা পোষাকের প্রকার এত ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত হয় যে, আজি যে পরিচ্ছদকে সৌন্দর্য্যের আদর্শ দেখি, কালি তাহাকে কদর্য্যতার উৎকর্ষ বলিয়া মনে হয়। যদি শ্রীমান্‌দের পরিচ্ছন্নবেশে জুতা মোজা পরিয়া বাহির হওয়া বিলাসিতা না হয়, তাহা হইলে শ্রীমতীদের কেন হইবে বুঝা যায় না। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে উহা নূতন। নূতন ত বটেই, কিন্তু তাহাতে কি হইল? পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পুরুষদের পক্ষে কোট, কামিজ, পায়জামা, মোজা ও রুমাল নূতন ছিল না কি?

আর এক কথা। আমি যে পোষাক পরিবর্ত্তনের সমর্থন করিতেছি, তাহার কারণ অস্মৎসম্ভূত নয়। মধুপুরাদি স্বাস্থ্যকর স্থানে হিন্দুমহিলার ভ্রমণ প্রথার প্রবর্ত্তয়িতা আমি নহি; আমি এইমাত্র বলিতে চাই যে যদি ভ্রমণার্থ হিন্দুমহিলা

বাটী হইতে বহির্গত হনই, তাহা হইলে তাঁর পোষাকের কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। যদি পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে না চাও, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি আমার এইমাত্র নিবেদন যে, কদাকার হাস্যোদ্দীপক বেশে আর বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে মধুপুরের বিশাল বটবৃক্ষ, গিরিডীর খাকো নদী ও বৈদ্যনাথের চন্দন-পাহাড় দেখিতে পাঠাইও না। দোহাই তোমাদের।

দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

("আম্মোক্তারী দাও।")

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। মহাশয় এঁদের সময় কই, ইংরেজের কর্ম্ম করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সদরওয়ালার প্রতি) আচ্ছা, তাঁকে আম্মোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর কেউ যদি ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক। তিনি যা কাজ কর্ত্তে দিয়েছেন, তাই করো।

বিড়ালছানার পাটোয়ারি বুদ্ধি নাই। মা মা করে। মা যদি হেঁশালে রাখে, সেইখানেই পড়ে আছে। কেবল 'মিউ মিউ' করে মাকে ডাকে। আবার যখন মা গৃহস্থের বিছানার উপর রাখে, তখনও সেই ভাব। নিশ্চিন্ত, মা মা করে।

সদরওয়ালা। মহাশয়, আমরা গৃহস্থ, কতদিন ও সব কর্ত্তব্য করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমাদের কর্ত্তব্য আছে বৈ কি? ছেলেদের মানুষ করতে হবে, স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করতে হবে ও অবর্ত্তমানে স্ত্রীর ভরণ পোষণের যোগাড় করে রাখতে হবে। তা যদি না কর, তুমি নির্দ্দয়। দয়া শুকদেবাদি রেখেছিলেন। দয়া যার নাই সে মানুষ নয়।

সদরওয়ালা। সন্তান প্রতিপালন কত দিন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত। পাখী বড় হলে, যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে ধাড়ী ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না। (সকলের হাস্য)

(গৃহস্থের কর্ত্তব্য; জ্ঞানোন্মাদ ও কর্ত্তব্য)

সদরওয়ালা। স্ত্রীর প্রতি কি কর্ত্তব্য?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি বেঁচে থাকতে থাকতে ধর্ম্মোপদেশ দিবে, আর ভরণ পোষণ করবে। যদি সতী হয়, তাহলে তোমার অবর্ত্তমানে তার খাবার যোগাড় করতে হবে। * * *

"তবে জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্ত্তব্য

থাকে না। তখন কালিকার জন্য তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন। জ্ঞানোন্মাদ হলে তিনি তোমার পরিবারদের জন্য ভাবেন। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন অছী (Guardian) সেই নাবালকের ভার লয়।

(সদরওয়ালার প্রতি) এ সব আইনের ব্যাপার তুমিত সব জান ?

সদরওয়ালা। আজ্ঞা হাঁ।

বিজয় গোস্বামী। আহা! আহা! কি কথা! যিনি অনন্যমনা হয়ে তাঁর চিন্তা করেন, যিনি তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁর ভার ভগবান্ নিজে বহন করেন। নাবালকের অমনি "অছী" এসে জোটে। আহা, কবে সেই অবস্থা হবে? যাঁদের হয়, তাঁরা কি ভাগ্যবান্!

ত্রৈলোক্য। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) মহাশয়, সংসারে যথার্থ কি জ্ঞান হয়? ঈশ্বরলাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) কেন গো, তুমিতো সাঁরে মাতে আছ (সকলের হাস্য)। ঈশ্বরে মন রেখে সংসার আদত। কেন সংসারে হবে না? অবশ্য হবে।

(জ্ঞানীর লক্ষণ; জীবন্মুক্ত)

ত্রৈলোক্য। সংসারে জ্ঞানলাভ হয়েছে, তার লক্ষণ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হরিনামে ধারা আর পুলক। তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর রোমাঞ্চ হবে, আর চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে পড়বে।

"যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহ-বুদ্ধি যায় না। বিষয়াসক্তি যত কমে, ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চলে যেতে পারা যায়; আর দেহ-বুদ্ধি কমে। বিষয়াসক্তি একেবারে চলে গেলে আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। নারিকেলের জল না শুকুলে দা দিয়ে কেটে শাঁস আলাদা, মালা আলাদা করা কঠিন হয়। জল যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে নড় নড় করে, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। একে বলে খোড়ো নারিকেল। ঈশ্বর লাভ যদি হয়ে থাকে, তাহলে লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খোড়ো নারিকেলের মত হয়ে যায়। দেহাত্ম-বুদ্ধি চলে যায়। দেহের সুখ দুঃখে আত্মার সুখ দুঃখ বোধ হয় না। সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না। কামিনী-কাঞ্চনের সুখ চায় না। সে জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়ায়। "কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।"

"যখন দেখবে ঈশ্বরের নাম করতেই অশ্রু ও পুলক হয়, তখন জানবে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হয়েছে। দেশলাই যদি শুকনো হয়, একটা ঘস্‌লেই দপ্ করে জলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘস্‌লেও কিছু হয় না। কেবল কাঠি-গুলা ফেলা যায়। বিষয়রসে র'সে থাকলে, কামিনী-কাঞ্চনরসে মন ভিজে থাকলে, ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় না। হাজার চেষ্টা কর,

কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।

(উপায় ব্যাকুলতা ;—আপনার মা।)

ত্রৈলোক্য। বিষয়রস শুকাবার এখন উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মার কাছে ব্যাকুল হয়ে ডাক। তাঁর দর্শন হলে বিষয়রস শুকিয়ে যাবে। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাকলে এক্ষুণি হয়। তিনি ত ধর্ম্ম মা নন। তিনি আপনারই মা। ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আব্দার কর। ছেলে ঘুড়ী কিনিবার জন্য মার আঁচল ধরে পয়সা চায়—মা হয় তো আর আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। প্রথমে মা কোনমতে দিতে চায় না। বলে, 'না, তিনি বারণ করে গেছেন, তিনি এলে বলে দিব, এক্ষুণি ঘুড়ী নিয়ে একটা কাণ্ড করবি'। যখন ছেলে কাঁদতে সুরু করে, কোনমতে ছাড়ে না, তখন মা অন্য মেয়েদের বলে, 'রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার শান্ত করে আসি।' এই কথা ব'লে চাবিটা দিয়ে কড়াৎ কড়াৎ করে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। তোমরাও মার কাছে আব্দার কর, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন। আমি শিখদের ঐ কথা বলেছিলাম। তারা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে এসেছিল। মা কালীর মন্দিরের সুমুখে বসে তাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তারা বলেছিল, "ঈশ্বর দয়াময়।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কিসে দয়াময় ? তারা বল্লে, 'কেন মহারাজ, এই তিনি সর্ব্বদা আমাদের দেখছেন, আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, সব দিচ্ছেন, আমাদের আহার যোগাচ্ছেন'। আমি বল্লুম, যদি কারো ছেলেপুলে হয়, তাদের খপর, তাদের খাওয়ার ভার বাপে নেবে না, তো কি বামুনপাড়ার লোকে এসে নেবে নাকি ?

সদরওয়ালা। মহাশয়, তবে তিনি কি দয়াময় নন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা কেন গো ? ও একটা বল্লুম, তিনি যে বড় আপনার লোক, তাঁর উপর আমাদের জোর চলে। আপনার লোককে এমন কথা পর্য্যন্ত বলা যায়, 'দিবিনারে শালা ?'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(অহঙ্কার ও সদরওয়ালা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সদরওয়ালার প্রতি) আচ্ছা, অভিমান, অহঙ্কার, জ্ঞানে হয়—না, অজ্ঞানে হয় ?

"অহঙ্কার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কার আড়াল আছে বলে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।'

"অহঙ্কার করা বৃথা। এ শরীর এ ঐশ্বর্য্য, কিছুই থাকবে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখ্‌ছিল। প্রতিমার সাজ গোজ দেখে বলছে, 'মা, যতই সাজোগোজো, দিন দুই তিন পরে তোমায় গঙ্গায় টেনে ফেলে দিবে' (সকলের হাস্য)। তাই সকলকে বল্‌ছি, জজই হও আর

যেই হও, সব দুদিনের জন্য। তাই অভিমান, অহঙ্কার ত্যাগ করতে হয়।

(ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য; লোক ভিন্ন প্রকৃতি।)

"সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ। তিন গুণের তিন রকম স্বভাব। তমোগুণীদের লক্ষণ:—অহঙ্কার, নিদ্রা, বেশী ভোজন, কাম, ক্রোধ এই সব। রজোগুণীরা বেশি কাজ জড়ায়, কাপড় পোষাক ফিটফাট্, বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বৈটকখানায় মহারাণীর (Queen) ছবি। যখন ঈশ্বর চিন্তা করে, তখন চেলি গরদ পরে; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার মাঝে মাঝে একটী একটী সোণার রুদ্রাক্ষ। যদি কেহ ঠাকুরবাড়ী দেখতে আসে, তবে সঙ্গে করে করে দেখায়, আর বলে, 'এদিকে আসুন আরো আছে, শ্বেত পাথরের, মার্ব্বেল পাথরের মেজ আছে, ষোল ফোকর নাটমন্দির আছে।' আবার দান করে লোককে দেখয়ে। সত্ত্বগুণী লোক অতি শিষ্ট শান্ত; পোষাক সাদা সিদে; রোজকার পেট চলা পর্য্যন্ত; কখনও লোকের তোষামোদ ক'রে ধন লয় না; বাড়ীতে মেরামত নাই; ছেলেদের পোষাকের জন্য ভাবে না; মান সম্ভ্রমের জন্য ব্যস্ত হয় না; ঈশ্বর চিন্তা, দান, ধ্যান, সমস্ত গোপনে—লোকে টের পায় না; মশারির ভিতর ধ্যান করে; লোকে ভাবে বাবুর রাতে ঘুম হয় নাই, তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাচ্ছেন। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ। সত্ত্বগুণ এলেই ঈশ্বরলাভের আর দেরি হয় না—আর একটু এলেই তাঁকে পাবে।

(সদরওয়ালার প্রতি) তুমি বলেছিলে সব লোক সমান, এই দেখ, কত ভিন্ন-প্রকৃতি!

(মানুষ কত রকম।)

"আর কত রকম থাক্ থাক্ আছে;—১ নিত্যজীব, ২ মুক্তজীব, ৩ মুমুক্ষুজীব, ৪ বদ্ধজীব,—এই চার রকম মানুষ। নারদ শুকদেব এরা সব নিত্যজীব, ষ্টিম্‌বোট (কলের জাহাজ) আপনিও পারে যেতে পারে, আবার বড় জীব জন্তু হাতী পর্য্যন্ত পারে নিয়ে যায়। নিত্যজীবেরা নায়েবের স্বরূপ; একটা তালুক শাসন করে—আর একটা তালুক শাসন করতে যায়। আবার মুমুক্ষুজীব আছে, যারা সংসার জাল থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে দুই একজন জাল থেকে পালাতে পারে, তাদের বলে মুক্ত-জীব। নিত্য জীবেরা এক একটা সিয়ানা মাছের মত কখনও জালে পড়ে না।

"কিন্তু বদ্ধজীব সংসারী জীব, তাদের হুঁস নাই, তারা জালে পড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হয়েছি, এরূপ জ্ঞানও নাই। এরা হরিকথা সম্মুখে হলে সেখান থেকে চলে যায়—বলে, হরিনাম মরবার সময় হবে, এখন কেন? আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে পরিবার কিম্বা ছেলেদের বলে, 'প্রদীপে অত সল্‌তে কেন, একটা সল্‌তে দাও, তা না হলে তেল পুড়ে

যাবে ; আর পরিবার ও ছেলেদের মনে করে কাঁদে আর বলে, হায়! আমি মলে এদের কি হবে। আর বদ্ধজীব যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে ; যেমন উটের কাঁটা ঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ে, তবু কাঁটা ঘাস খেতে ছাড়বে না। এ দিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হবে! বলে, কি করবো, অদৃষ্টে ছিল! যদি তীর্থ করতে যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্তা করবার অবসর পায় না—কেবল পরিবারদের পুঁটুলি বহিতে বহিতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াইতে আর গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের পেটের জন্ত আর পরিবারদের পেটের জন্ত দাসত্ব করে—আর মিথ্যা কথা ব'লে ও প্রবঞ্চনা, তোষামোদ ক'রে ধন উপার্জ্জন করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, যারা ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল বলে উড়িয়ে দেয়। (সদরওয়ালার প্রতি) মানুষ কত রকম দেখ, তুমি সব এক বল্‌ছিলে, তা দেখ, কত ভিন্ন প্রকৃতি, কারুর বেশী শক্তি, কারুর কম।

(মৃত্যুকাল ও ঈশ্বরের নাম)

"সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপলে, গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থে গেলে কি হবে? সংসার-আসক্তি ভিতরে থাক্‌লে মৃত্যুকালে সেটী দেখা দেয়। কত আবল তাবল বকে, হয়তো বিকারের খেয়ালে 'হলুদ' 'পাঁচফোড়ন' 'তেজপাত' বলে চেঁচিয়ে উঠলো। (সকলের হাস্য)। শুকপাখী সহজ বেলা রাধাকৃষ্ণ বলে, বিল্লি ধরলে নিজের বুলি ক্যাঁ ক্যাঁ করে। (সকলের হাস্য)।

"গীতায় আছে, মৃত্যুকালে যা মনে করবে, পরলোকে তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ' 'হরিণ' করে দেহত্যাগ করেছিল, তাই 'হরিণ' জন্ম হলো। ঈশ্বর চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয় না।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়, অন্য সময় ঈশ্বর চিন্তা করেছে, কিন্তু মৃত্যুসময় করে নাই বলে, কি আবার এই সুখদুঃখময় সংসারে আসতে হবে? কেন, আগেতো ঈশ্বর চিন্তা করেছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়। যেমন এই হাতীকে স্নান করয়ে দিলে আবার ধূলা কাদা মাখে। মন মত্ত করী। তবে হাতীকে নাইয়ে যদি আস্তাবলে সাঁধ করিয়ে দিতে পার, তা হ'লে আর ধূলা কাদা মাখতে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে, তা'হলে শুদ্ধমন হয়, আর সে মন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হবার অবসর পায় না।

ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাই এতো কর্ম্ম-ভোগ। লোকে বলে যে গঙ্গাস্নানের

সময় পাপগুলো গঙ্গার তীরের গাছের উপর বসে থাকে। যেই তুমি গঙ্গাস্নান করে তীরে উঠছ, অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে (সকলের হাস্য)।

দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর চিন্তা হয়, আগে থাকতে তার উপায় করতে হয়। উপায়—অভ্যাস যোগ। ঈশ্বর চিন্তা করতে রোজ অভ্যাস করতে করতে শেষের দিনেও তাঁকে মনে পড়বে।

ব্রাহ্মভক্ত। বেশ কথা হলো। অতি সুন্দর কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি এলোমেলো বল্লুম, তবে আমার ভাব কি জান? আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, আমি ঘর, তিনি ঘরণী, আমি গাড়ী, তিনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি রথ, তিনি রথী, যেমন চালান তেমনি চলি, যেমন করান তেমনি করি।

(ক্রমশঃ)।

বায়ুমণ্ডল।

ইতিহাস—অতি পূর্ব্বকালে সর্ব্বদেশীয় পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ বায়ুকে পঞ্চভূত পদার্থ মধ্যে গণনা করিতেন; এমন কি ইউরোপে গ্রীশদেশীয় পণ্ডিত অরিষ্টটলের সময় হইতে ১৮০০ খ্রীঃ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত ভূ-বায়ু পঞ্চভূত (রূঢ়) পদার্থ মধ্যে পরিগণিত ছিল। পরে ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে ডাক্তার লেবোজিয়র স্থির করেন (Lavoisier) বায়ু মূল পদার্থ নহে, যৌগিক পদার্থ। বায়ু যৌগিক পদার্থও নহে।

বায়ু যে যৌগিক পদার্থ নহে—মিশ্র পদার্থ, নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

(১) যেখানে দুই কিম্বা ততোধিক বস্তু রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হয়, সেইখানেই তাদের ভাগ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকে, কিন্তু পৃথিবীর সকল স্থানের বায়ু পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উহাতে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদের পরিমাণ সকল স্থানে সমান নয়, অতএব বায়ু যৌগিক পদার্থ নহে, মিশ্র পদার্থ।

(২) যেখানে দুই বা ততোধিক বস্তু রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হয়, সেই খানেই তাহাদের রূপান্তর, গুণান্তর ও তাপের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বায়ুতে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহাদের প্রত্যেকের গুণ উহাতে সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে বিদ্যমান আছে, অতএব বায়ু যৌগিক পদার্থ নহে, মিশ্র পদার্থ।

(৩) বায়ুস্থ অম্লজান, যবক্ষারজান অপেক্ষা জলে অধিক পরিমাণে দ্রব হয়। একটী বোতলের খানিক অংশ জলপূর্ণ

করিয়া উহার মুখ কাক দ্বারা রুদ্ধ কর, অনন্তর কিয়ৎক্ষণ ঐ বোতল অনবরত আলোড়িত করিলে উহাতে কিয়দংশ বায়ু দ্রব হয়; তৎপরে ঐ জল উত্তপ্ত করিলে দ্রবীভূত বায়ু বহির্গত হইবে এবং উক্ত বায়ু পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহাতে এক আয়তন অম্লজান ও ১০৮আয়তন নাইট্রজান দ্রব হইয়াছে। কেবল নাড়িয়া কোন বস্তুর রাসায়নিক সংযোগ বিশ্লেষ করা যায় না; কিন্তু এই স্থলে কেবল নাড়াতেই সংযোগের বিশ্লেষ হইতেছে। অতএব বায়ু যৌগিক পদার্থ নহে, মিশ্র পদার্থ। যদি বায়ু যৌগিক পদার্থ হইত তাহাহইলে উহাতে ১/৫ অক্সিজেন ও ৪/৫ নাইট্রজান দেখা যাইত।

১০০ লিটর বায়ুতে নিম্ন লিখিত পদার্থ আছে :—

অম্লজান (O) = ২০.৬।

যবক্ষারজান (N) (নাইট্রোজান) = ৭৭.৯।

অঙ্গারজান (কার্ব্বনিক এসিড) (Co২) = ০.০৪।

জলীয় বাষ্প = ১.৪৬।

এমোনিয়া (NH৩) = লেশ মাত্র।

বায়ু রাশির গুরুত্বে যে ৭৭ ভাগ (N) ও ২৩ ভাগ (O) আছে, তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে।

উত্তপ্ত তাম্রচূর্ণের উপর দিয়া সরল বায়ুর স্রোত চালাইলে যদি ৭৭ ভাগ N বিযুক্ত হয়, তাহা হইলে নলের ভার ২৩ গ্রাম বৃদ্ধি পায়। অতএব সপ্রমাণ হইল বায়ুর গুরুত্বে ৭৭ ভাগ N ও ২৩ ভাগ O আছে।

বায়ুর আয়তনে যে ৭৯ ভাগ N ও ২১ ভাগ O আছে, তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে।

কোন প্রকাণ্ড জলপূর্ণ পাত্রের উপর একটী ক্ষুদ্র পাত্র ভাসমান রাখিয়া, উহার উপর একখণ্ড ফস্ফরাস জ্বালাইয়া দাও, তাহা হইলে উহা বোতলের অন্তর্গত অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া জলমধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে এবং বোতলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জল উঠিবে। যদি ঐ পাত্রটী ১০০ ভাগে বিভক্ত থাকে, তাহা হইলে দেখা যায় ২১ অংশ জল উঠিয়াছে। অতএব বায়ুতে আয়তনে ১০০ ভাগে ৭৯ ভাগ N ও ২১ ভাগ O আছে।

বায়ুতে যে এক-পঞ্চমাংশ O আছে, তাহা অসংযুক্ত অবস্থায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকাতে প্রাণিগণ নিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করে। উহা আমাদের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরস্থ অঙ্গারের সহিত মিলিত হইয়া কার্ব্বনিক আসিড (Co২) রূপে বহির্গত হয়, তাহাতেই আমাদের শরীরের রক্তসংস্কার ও তাপ রক্ষা হইয়া থাকে। সেই কার্ব্বনিক আসিড হইতে বৃক্ষেরা কার্ব্বন ভাগ গ্রহণ করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় এবং পুনর্ব্বার অম্লজান ভাগ ত্যাগ করে; এ কারণ বৃক্ষদিগের সহিত আমাদিগের সর্ব্বদা বিনিময় কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে অর্থাৎ আমরা যে দূষিত বায়ু প্রশ্বাসে পরিত্যাগ করিতেছি,

বৃক্ষেরা তাহা গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে এবং যে বিশুদ্ধ অম্লজান বায়ু বৃক্ষ সকলের পত্র হইতে বিনির্গত হয়, তাহা গ্রহণ করিয়া আমরা বাঁচিতেছি। অম্লজান অভাবে যেমন কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ উহার আধিক্য হইলেও জীবন ধারণ করা যায় না। এ কারণ বায়ুরাশিতে যে ৪/৫ অংশ যবক্ষারজান আছে, তাহা অসংযুক্ত অবস্থায় সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে বিদ্যমান থাকাতে অম্লজান আমাদের ব্যবহার্য্য। প্রচুর পরিমাণ নাইট্রজেনের সহিত অল্প পরিমাণ অক্সিজেন স্বীয় প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না। যেমন এক কলসী জলে কিঞ্চিৎ চিনি দিলে তাহার মিষ্টস্বাদ থাকে না, সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে N এর সহিত অল্প O থাকাতে O স্বীয় প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না। যদি যবক্ষারজান না থাকিত, তাহা হইলে অক্সিজেন অল্প তাপে সমুদয় পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিত। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে বৃক্ষেরা কার্ব্বনিক আসিড শোষণ করিয়া অঙ্গার ভাগ গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। এ কারণ অম্লজান বায়ুরাশিতে সর্ব্বত্র অপরিবর্ত্তনীয় থাকিতেছে।

নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে—

(১) একটী কলসী খানিক জলপূর্ণ করতঃ উহার মুখ কার্ব্বনিক এসিড দ্বারা পূর্ণ কর, পরে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা একটী সজীব বৃক্ষ শাখা কাটিয়া উহার ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দাও এবং সূর্য্যকিরণে স্থাপন কর। পরে সূর্য্যকিরণের প্রখরতা অনুসারে এক হইতে ছয় ঘণ্টার মধ্যে উহার মধ্যস্থ সমুদায় কার্ব্বন নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। তখন উহার মধ্যে জ্বলিত বাতি প্রবিষ্ট করিয়া দিলে নিবিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। অতএব সপ্রমাণ হইল যে বৃক্ষেরা কার্ব্বনিক এসিড (CO_2) হইতে কার্ব্বন ভাগ গ্রহণ করে, অম্লজান ত্যাগ করে।

বায়ুতে যে কার্ব্বনিক এসিড আছে, তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে—

১। যদি কোন পাত্রে খানিক চূণের জল বায়ু মধ্যে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বায়ুস্থ কার্ব্বনিক এসিড চূণের সহিত সংযুক্ত হইয়া উহার উপর এক প্রকার শ্বেতবর্ণ স্তর উৎপন্ন হয়; অতএব বায়ুতে কার্ব্বনিক এসিড আছে।

২। আর্দ্র ফ্লানেলের উপর সরিষা বীজ বপন করিয়া উহাতে জল সেচন কর; তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে ঐ সকল বীজ অঙ্কুরিত, মুকুলিত, বর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইবে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ উহাদের কার্ব্বন কোথা হইতে আসিল? ফ্লানেলের কোন অংশ উহার সহিত মিলিত হয় না, কারণ উহা যেমন তেমনি থাকে; জলে কিয়দংশে উহা পোষণ করে বটে, কিন্তু জলেতে ত কার্ব্বন নাই; সুতরাং বায়ু হইতে কার্ব্বন

গৃহীত হয়, অতএব বায়ুতে কার্ব্বন আছে।

বায়ুতে জলীয় বাষ্প আছে বলিয়া মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত প্রভৃতি হইয়া থাকে। যখন উহা শীতল হয়, তখন সূক্ষ্ম জল-কণার আকারে আমাদের নয়নগোচর হয়। বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প আছে, নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে :—

একটী পরিষ্কৃত কাঁচের গ্লাসে একখণ্ড বরফ রাখিয়া উহা বায়ু মধ্যে স্থাপন কর। বরফ সংযোগে ঐ স্থানের বায়ু অত্যন্ত শীতল হওয়াতে বায়ুস্থ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-কণার আকারে গ্লাসের উপর পরিণত হয়।

আমোনিয়া বৃক্ষদের খাদ্য সামগ্রী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন বৃক্ষদিগের বীজ উৎপাদনের সময় হয়, তখন উহাতে নাইট্রজেনের আবশ্যক হয়; কিন্তু উহারা বায়ুব্যাপ্ত নাইট্রজেন গ্রহণ করিতে পারে না; উহারা আমোনিয়া হইতে নাইট্রজেন গ্রহণ করে; অতএব বায়ুতে আমোনিয়া আছে।

ধর্ম্ম—বায়ু বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদহীন, স্বচ্ছ, অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ এবং স্থিতিস্থাপক; তাপে প্রসারিত ও চাপে সঙ্কুচিত হয়। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বায়ুর ভার আছে। প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চিতে ৴৭॥ সাড়ে সাত সের। কাহারও মতে বায়ু ঊর্দ্ধে ১০০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত; কাহারও মতে ৪৫ মাইল পর্য্যন্ত বায়ু আছে। কিন্তু ৪৫ মাইলের নীচে কেহই স্বীকার করেন না। একটী পাত্রে তৈল, জল, ও পারদ রাখিয়া দিলে তাহাদের গুরুত্ব অনুসারে সর্ব্বনিম্নে পারদ ও তদুপরি জল ও তাহার উপর তৈল থাকে কি? বায়বীয় পদার্থের এই এক আশ্চর্য্য গুণ যে, উহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভার হইলেও উহারা সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে বিদ্যমান আছে। গ্রেহাম (Graham) সাহেব বাষ্প সকলের গুরুত্বের তারতম্য সত্ত্বেও সমভাবে মিশ্রণ এইটী আবিষ্কার করেন। ইহাকে (Diffusion of Gases) কহে।

আর্য্য পরিবার।

যখন ধীশক্তিসম্পন্ন আর্য্যগণ জ্ঞান বিজ্ঞানাদি অশেষ বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন, যখন শৌর্য্যে বীর্য্যে আর্য্যগণের সমকক্ষ জগতে কেহই ছিল না, যখন আর্য্যগণ বাহ্য উন্নতি অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতারও কিছুমাত্র অভাব লক্ষিত হইত না। প্রায়

সহস্রাধিক বৎসর অতীত হইল, ভারতের কপাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হতভাগ্য ভারতবাসী দিন দিন দুর্ব্বল, ক্ষীণমস্তিষ্ক ও হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছেন। যে পরিবারে লক্ষীর আবির্ভাব অন্তর্হিত, সেই পরিবারে সুখের আশা আর কি? পূর্ব্বকালে আর্য্য নরনারীদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সাংসারিক কার্য্যপদ্ধতি এবং মানসিক গতি কি সুন্দর ছিল, এবং বর্ত্তমানকালে তাহা কত বিকৃত হইয়াছে, ইহা পর্য্যালোচনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

অহো! বিশ্ব-নিয়ন্তা বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল! যাহা জীব-জীবনের প্রধান অবলম্বন, যাহা দ্বারা জগতের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, পক্ষান্তরে তাহাই আবার জগৎ বিনাশের একমাত্র কারণ। যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রগুলির অস্তিত্ব না থাকিলে কখনও জীবদেহ সংরক্ষিত বা পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। আবার ঐ সকল যন্ত্র দ্বারাই জীবদিগকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে দেখা যায়। কাম ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুর সাহায্য না পাইলে সাংসারিক সর্ব্ববিধ সুখ সম্ভোগ কাহারও ভাগ্যে সংঘটিত হয় না। আবার ঐ সকল রিপু অযথা পরিচালিত হইয়া জীবদিগকে ঘোরতর অন্ধকারময় কুম্ভিপাকে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিত হইতে হয়। আর্য্য ঋষিগণ নিরবচ্ছিন্ন সুখের স্থানকে স্বর্গ এবং নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের স্থানকে নরক কহিয়াছেন। কিন্তু সংসার ভালমন্দ মিশ্রিত—সুখ দুঃখ জড়িত বিষম পরীক্ষা-স্থল। এই ভালমন্দ মিশ্রিত—সুখ দুঃখ জড়িত সংসারে বিচরণ করিতে হইলে বিলক্ষণ বিজ্ঞতার প্রয়োজন। সংসারে পদে পদেই সকলকে বিপদে পতিত হইতে হয়। ইহাই স্বর্গ এবং নরকের দ্বারস্বরূপ। স্ত্রীজাতি এই দ্বারের অর্গল। স্ত্রীজাতি দ্বারাই স্বর্গের পথ পরিষ্কার হয় এবং স্ত্রীজাতি দ্বারাই নরকের দ্বার উদঘাটিত হইয়া থাকে।

যে সকল আত্মীয় স্বজন পরস্পর একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং একই স্থানে আহার করিয়া একত্র জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে পরিবার কহে। পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর কি প্রকার সদ্ভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন তাহাও এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে।

আর্য্য-পরিবারের যে প্রকার গঠন তাহাতে ইহার যাবতীয় সুখস্বচ্ছন্দতা স্ত্রীজাতির উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। পরিবারস্থ স্ত্রীমণ্ডলী-মধ্যে একতা-বন্ধন দৃঢ় থাকিলে সেই পরিবারের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই প্রাচীন আর্য্যগণ রমণীদিগকে ভূয়সী প্রশংসা এবং তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা রমণীদিগকে গৃহ-লক্ষ্মী বলিয়াছেন। ফলতঃ সংসার-মধ্যে রমণীগণই যে লক্ষ্মীস্বরূপিণী, রমণীগণই যে সর্ব্বদা পুরুষ দেহে শক্তিসঞ্চারিণী, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আবার পক্ষান্তরে অনুসন্ধান করিয়া

দেখিলে রমণীদিগকেই যাবতীয় দুঃখের নিদান বলিয়া মীমাংসা করা যায়। অসচ্চরিত্রা রমণীদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহারা ক্ষণকাল মধ্যেই সুখের সংসারকে চিরকালের জন্য অতলতলে নিমগ্ন করিয়া ফেলে। পূর্ব্বকালে আর্য্য-মহিলাদিগের চরিত্র অতিশয় নির্ম্মল ছিল। তাই আর্য্যগণ পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীচরিত্রে পূর্ব্বের ন্যায় গুণ সকল দেখিতে পাওয়া যায় না। আলস্য, বিলাসিতা, কুটিলতা, হিংসা, বাচালতা প্রভৃতি নানা প্রকার হীন ভাব এক্ষণে স্ত্রীচরিত্রকে ক্রমশঃ মলিন করিতেছে। তাই আর্য্য সংসারের এতদূর অবনতি হইতেছে। যাহাতে স্ত্রীচরিত্র বিশেষরূপ সংশোধিত হয়—যাহাতে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অসদ্-বৃত্তিগুলি অন্তর হইতে একবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে আন্তরিক যত্ন প্রদর্শন ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

জীব-জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগের জন্য নয়। রক্তমাংস গঠিত ক্ষণভঙ্গুর জীব-দেহ ধারণ করিয়া পাঞ্চভৌতিক জগতে বিচরণ করিতে হইলে কখনও বা সুখ, কখনও বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই প্রকার সুখ দুঃখের অপরিহার্য্য ঘাত প্রতিঘাতে, যিনি আপনার লক্ষ স্থির রাখিতে পারেন, তিনিই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্বপতির অতুল প্রেমের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহারই ভাগ্যে অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ প্রাপ্তি অথবা একবারে নির্ব্বাণ মুক্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। যিনি মায়া-মোহ-জড়িত সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, সুখ দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়েন, যিনি রোগে শোকে জরাজীর্ণ হইয়া অথবা ক্ষণিক সুখে উৎফুল্ল হইয়া আপনার লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারেন না, যিনি কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় পদে পদে বিপথে গমন করিয়া থাকেন, তিনি কখনও শান্তিময়ের শান্তিরাজ্যে উপস্থিত হইয়া আপনাকে প্রশান্ত করিতে সক্ষম হয়েন না।

এ স্থলে মহাভাগবতী পুরাণোক্ত একটী উপন্যাস বর্ণিত হইতেছে। একদা জয়া বিজয়া নাম্নী দুইটী সহচরী নিভৃত কক্ষে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে জয়া কহিলেন, আর ত বাঁচি না! এমন করিয়া দিন রাত পরিশ্রম করিলে কি শরীর টেকে? না, মনেরই কিছু শান্তি জন্মে?

সেই কথা শুনিয়া বিজয়া কহিলেন, কেন বোন! আজ তুমি এরূপ বলিতেছ কেন? সংসারে কর্ম্ম ভিন্ন যে আর কিছুই নাই, কর্ম্মের জন্যই জন্মগ্রহণ—কর্ম্মের জন্যই জীবন ধারণ, কর্ম্ম না করিলে যে ক্ষণকালের জন্যও শান্তি লাভ হয় না, তাহা আর কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিব?

জয়া। তাই বলিয়া কি এত পরিশ্রম করা যায়? তাও আবার পরের জন্য।

বিজয়া। আজ তুমি এমন অনার্য্যের ন্যায় কথা বলিতেছ কেন ? মুখে "সর্ব্বভূতে সমভাব" বলিয়া কার্য্যতঃ তাহার বিরুদ্ধাচরণ, কখনও আর্য্যজাতি-সম্মত নহে। কে আত্মীয়, কে পর, তাহা কি তুমি নিশ্চয়রূপে বলিতে পার ?

জয়া। কেন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের পক্ষে আর কে আত্মীয় হইতে পারে ? তবে পুত্র কন্যা বা পিতা মাতাকেও আত্মীয় বলা যায়।

বিজয়া। তুমি নিতান্ত-ভ্রান্ত। এতকাল পর্য্যন্ত সংসারের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আজও যে তোমার আত্ম-পর জ্ঞান জন্মে নাই, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণিগণই কেবল আপন আপন শরীরকে আপনার বলিয়া মনে করে। তদ্ভিন্ন জগতের প্রত্যেক প্রাণীই তাহাদিগের নিকট পর। তাহাদিগের স্বামী স্ত্রীরও কোনও স্থিরতা নাই। সন্তান যতদিন পর্য্যন্ত গর্ভমধ্যে অবস্থিতি করে, কেবল ততদিনই তাহাদিগকে আত্মীয় ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকে, যেই গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, অমনি তাহারাও তখন পর হইয়া দাঁড়ায়। আবার পশু পক্ষীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহাদিগের [illegible] ব্যবহারও প্রায় এইরূপই দেখিবে। [illegible] প্রভেদের মধ্যে এই যে, তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ যতদিন পর্য্যন্ত আপনাপন ইচ্ছানুসারে গমনাগমন বা আহার অন্বেষণ করিতে না পারে, ততদিনই তাহারা সন্তানগণকে আত্মীয় বলিয়া মনে করে। অসভ্য মানবগণ আবার এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগের সামাজিক রীতি নীতি এবং পারিবারিক নিয়মাদি সর্ব্বথা প্রশংসনীয় নহে। আবার যে সকল মানব ক্রমশঃ সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদিগের সামাজিক রীতি নীতি এবং পারিবারিক নিয়মাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে কেবল পতিপত্নীর মধ্যেই পরস্পর আত্মীয় ভাব উপলব্ধি হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ অপেক্ষা বড় বেশী কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয় না। আজ সংক্ষেপে তোমার নিকট পারিবারিক বিষয় বর্ণন করিতেছি। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ মীমাংসা করিয়াছেন যে, একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবই (পরব্রহ্ম) সকলের পরমাত্মীয়। কিন্তু তিনি দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত, কেহই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার প্রতি আত্মীয় ভাব প্রতীয়মান হওয়া বড়ই দুঃসাধ্য। প্রথমে সর্ব্বভূতে আত্মীয় ভাব (সমভাব) না হইলে কখনও সেই বাসুদেবকে আত্মীয় ভাবে ভাবিতে পারা যায় না। সর্ব্বভূতে সমভাবও সহজে সুসিদ্ধ হয় না। ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা তাহা শিক্ষা করিতে হয়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ সেই বাসুদেব-তেজ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। তিনি সকলেরই বীজ। সেই বীজ নানা স্থানে নানা প্রকার ভাবে অঙ্কুরিত হইয়া নানা প্রকার ফলোৎপাদন করিতেছে।

সুতরাং পার্থিব সকল বস্তুর সহিতই সকল বস্তুর অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। সামান্ত তৃণ হইতে সর্ব্বনিয়ন্তা বাসুদেব পর্য্যন্ত সকলকেই সর্ব্বদা পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। এইরূপ সর্ব্বভূতে সমভাব যে যে উপায়ে উৎপন্ন হয়, এক্ষণে তাহাও বলা যাইতেছে। যাঁহাদিগের অনুগ্রহে জন্মগ্রহণ এবং নিরাপদে জীবন ধারণ হইয়া থাকে, নিজ শরীরের ন্যায় সেই পরমাত্মীয় পিতা মাতার শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের চিত্ত-বিনোদনের জন্ম প্রাণপণে সর্ব্বদা যত্ন করিবে। পিতা মাতা রুষ্ট হইলে ত্রিলোক-পিতাও রুষ্ট হইয়া থাকেন। তাহার পর পতি। পতি ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর গতি নাই। যাহাতে সর্ব্বদা পতির মনোরঞ্জন হয়, যাহাতে ক্ষণকালের জন্যও পতির অন্তঃকরণে অশান্তির উদয় না হয়, যাহাতে পতি-প্রেমে আদরিণী হইয়া সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিবে; নতুবা সেই বিশ্ব-পতির অতুল প্রেমে বঞ্চিতা হইতে হয়। অনন্তর পুত্রকন্যা জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতি সকলের সহিতই সৌহৃদ্য স্থাপন করিবে এবং সকলকেই সর্ব্বদা প্রেম-চক্ষে দর্শন করিবে। এই পর্য্যন্তই সংসারের সীমা। তার পর যিনি যত অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তিনি ততই সকলকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া সকলের প্রণয়-ভাজন হইয়া থাকেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে গ্রামবাসী, দেশবাসী এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রণয়-পাত্রী হইতে পারিলে পরিশেষে সর্ব্বভূতে সমভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই ব্রহ্মানন্দ লাভের প্রথম সোপান। যাঁহারা পিতামাতা পতিপুত্র প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের প্রেমলাভে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের কোনও উপকার হইতে পারে না। আবার তাহা না হইলে ভগবদ্ভক্তিরও উদয় হয় না। সুতরাং ভগবানের প্রেম-লাভও সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্তরে কুটিল ভাব পোষণ করিয়া মুখে মাত্র দিবা রাত্রি "হরি হরি" বলিলে কখনও সেই হরির স্নেহাস্পদ হইতে পারা যায় না। সংসারে যাহা কিছু দেখিবে, তৎসমস্তই সেই বাসুদেব হরির অংশ। পতিপুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সহিত অথবা চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থের সহিত যখন যে প্রকার ব্যবহার করা যায়, তৎসমস্তই সেই বাসুদেবে অর্পিত হয়। সেই এক হইতেই সকলের উৎপত্তি, সুতরাং সকলকেই আত্মীয় বলা যায়। সংসারে কাহাকেও পর বলিয়া জ্ঞান করা উচিত নয়। এই সকল কথা মনে রাখিয়া সকলের জন্যই সর্ব্বদা পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)।

ভুল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

৪

পরদিন প্রভাতে আমি যখন শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালের বেশভূষাদি সমাপনপূর্ব্বক নীচে আহার-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম, তখন দেখিলাম কেবলমাত্র তিনি ননীকে লইয়া খেলিতেছেন, দূরে আয়া দাঁড়াইয়া আছে। ননী দিদির সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। আমি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি আসন হইতে উঠিয়া হাসিয়া আমায় অভ্যর্থনা করিলেন। আমার হৃদয় কম্পিত হইল, আমি বুঝিলাম এও এক কৌশল। হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া এ কি নূতন ভাবে তিনি আজ আসিয়াছেন? আমার গর্ব্ব, মান অভিমান সবি তুচ্ছ করিতেছেন, সবি বুঝি ভাসিয়া যায়। আমি দূরে এক আসনে বসিবার পরেই চারু ও সুষমা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া আনন্দে নানা কথা কহিতে লাগিল। ঘরময় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তিনিও বালকের মত তাহাদিগের সহিত হাসিতে লাগিলেন, নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক দেখাইতে লাগিলেন। এমন সময় দিদি ও মিঃ বসু সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দিদি বিদ্যুতের মত আমার প্রতি চাহিলেন। আশায় আনন্দে যেন তাঁহার মুখে এক অভিনব ভাব প্রকাশিত হইল, কিন্তু আমার মলিন মুখ ও অশ্রুপূর্ণ নয়ন দেখিয়া বোধ হয় সকলি বুঝিতে পারিলেন। কারণ পরক্ষণেই তাঁহার সেই হাস্যপূর্ণ আনন বিষাদ-গম্ভীর হইয়া গেল। সকলে চা পান করিতে বসিলেন। নানা কথা বার্ত্তার পর তিনি বলিলেন, দুদিন বাদে বিলাত যাইতেছেন, যাইবার সমস্ত ঠিক্ হইয়াছে, ক্যাবিনও ভাড়া হইয়াছে। যাইবার প্যাসেজ ভাড়া জমা দিয়া আসিয়াছেন। এই সকল কথা তিনি এমন সরল রহস্যপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, জানি না তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, আমার হৃদয় সহস্র সূচীবিদ্ধ হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য! এত শীঘ্র পুরুষে সকল কথা ভুলিতে পারে? এ জগতে কিছুরই মূল্য নাই, প্রণয় প্রেম সকলি মিথ্যা। আমি সে সব কথার কোন উত্তর না দিয়া নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিলাম। চা পান শেষ হইয়া গেলে তিনি তাঁহার ভগিনীপতির হস্ত ধারণ করিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন।

দিদি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আমার হস্ত ধারণ করিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন—

"এলা, আমার কথা রাখিলে না?"

আমি সহসা হৃদয়ের আবেগে কহিলাম "হাঁ দিদি, আমি তোমার কথা রাখিব,

আমি কোনরূপে তাঁহাকে যাইতে দিব না, কখনও না।”

দিদি আশ্বস্তা হইয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলেন। সারা দিন কাটিয়া গেল, আর দেখা নাই, আর আসিলেন না। তাঁহার ভগিনীপতিকে সঙ্গে লইয়া আবশ্যক দ্রব্য সকল কিনিতে দোকানে গিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরে আহারের পূর্ব্বে মিঃ বসু একা ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—

“সুকোর এক বন্ধু তাহাকে লইয়া গেল, সে এ বেলা সেই খানেই আহার করিবে। কই রাত্রে আসিবার কথা ত বলিল না।”

আমি বুঝিলাম যে, তিনি আসিবেন না। সারা রাত চক্ষের জলে অন্ধ হইয়া আশার আগ্রহে দ্বারের পানে চাহিয়া রাত্রি কাটাইলাম। একবার সে রাত্রে যদি তিনি আসিতেন, একবার ‘এলা’ বলিয়া ডাকিতেন, আমি হয় ত আর তাঁহাকে জন্মের মত ছাড়িতে পারিতাম না। জগতে ঘৃণিত হইয়াও তাঁহার দাসী হইয়া থাকিতাম। তাহার পরদিনও তিনি নিজে সকালে আসিলেন না দেখিয়া দিদি তাঁহাকে বন্ধুর বাটী হইতে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। দ্বিপ্রহরের আহারের সময় তিনি আসিলেন। সেই দিন শেষ রাত্রে তিনি জাহাজে চড়িবেন, অতি প্রত্যূষে জাহাজ বিলাত যাত্রা করিবে। আর মধ্যে কয়েক ঘণ্টা, তাহার পর উভয়ের মাঝখানে সমুদ্রের ব্যবধান। আমি কি করিব, কখন কথা বলিব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একবারও একা আমার সহিত সেই গৃহে রহিলেন না। যখনি গৃহ শূন্য হয়, অমনি বেহারা বা ভৃত্যকে কোন না কোন দ্রব্য আনিতে বলিতে লাগিলেন। বৈকালে বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইতে গিয়া সন্ধ্যার সময় দুইজন বন্ধুকে লইয়া আসিলেন। দিদি তাঁহাদের আহারাদির সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে, ভাইয়ের জন্য স্বহস্তে কিছু মিষ্টান্ন করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার দেখাও হয় নাই। রাত্রি-ভোজনের পর সকলে বারটা রাত্রি পর্য্যন্ত ড্রইংরুমে বসিয়া রহিলেন। তিনি সকলকার সঙ্গে হাসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন, কখনও পিয়ানও বাজাইতে লাগিলেন। সকলকার সহিত যেমন গল্প করিতেছিলেন, আমারও সঙ্গে সেই প্রকার হাসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া সকলে বিদায় লইয়া আপন আপন শয়ন-কক্ষে গমন করিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের সহিত তাঁহাদিগের শয়নকক্ষ দেখাইতে চলিয়া গেলেন।

দিদি সে দিন চারু ও সুষমাকে আপন শয়নকক্ষেই রাখিয়াছিলেন। আমি একাকী অনাহার ও নিরাশার তীব্র দহনে অনিদ্রায় সারারাতি কাটাইলাম। নিষ্ঠুর তখনো কি আমায় ক্ষমা করিতে পারিলেন না! আমি কি করিব, নূতন সেখানে গিয়াছিলাম, সকলকার শয়নকক্ষও জানিতাম না। সে রাত্রির অসহনীয় যন্ত্রণা—হৃদয়ের দুরন্ত আবেগ অবর্ণনীয়।

রাত্রি চারি ঘটিকার সময় দিদি আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

"একি সারারাত একা আছ? সুকো এখানে ছিল না? আশ্চর্য্য! সে এইমাত্র আমায় উঠাইল, বলিল 'দিদি চল আমায় পঁহুছাইতে যাইবে।' চারু ননী ত যাইবার জন্ত ধুম লাগাইয়াছে, এলা তুমিও কি যাইবে? আমি উঠিয়া নীরবে সায় দিলাম। দিদি আমার নিকটে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—

"এলা, আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ, ফিরাইতে না পার, উভয়ের মনের এ অন্তরাল যদি দূর করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিও, আমি সুকোকে তোমার কাছে পাঠাইতে যাইতেছি।"

দিদি চলিয়া গেলেন। আমি বাহিরের যাইবার বস্ত্র পরিধান করিতেছিলাম, এমন সময় তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চারু আসিল। সেই নিষ্প্রভ প্রদীপের আলোকে দেখিলাম তাঁহার সেই অনিন্দ্য সুন্দর মুখ কত শীর্ণ দেখাইতেছে, সেই হাস্যোজ্জ্বল নয়নের কোলে কালিমা পড়িয়াছে। আমার রুদ্ধ হৃদয়ের যন্ত্রণা অব্যক্ত, বলিবার কি শক্তি হইবে? তিনি আসিয়া আমার নিকট অগ্রসর হইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিলেন—

"এলা, তুমি কি যাইতেছ নাকি? তা বেশত! আমায় ডাকিয়াছিলে কি?"

আমি রুদ্ধ জড়িত কণ্ঠে কহিলাম—

"তুমি যাইও না"—

"তাহা হইলে তুমি পূর্ব্বের এলা হইবে? আমার নিকটে আসিবে?"

যতদিন না তদন্ত হয়, আমি না হয় এখানে দিদির নিকট থাকিব,—আমার কথা শেষ না হইতে তিনি বলিলেন—

"ওঃ তোমার কথা বুঝিলাম, আচ্ছা তোমারই কথা রহিল, তুমি যতদিন না তদন্ত হয়, এখানেই থাকিও। আমার এদেশে থাকিবার ইচ্ছা নাই। এক বৎসর পরে আসিব, ছুটী না ফুরাইলে কি প্রকারে আসিব?

চমকিত হইয়া আমি বলিলাম—"এক বৎসর পরে?" আর বাক্য সরিল না। তিনি আর আমার কথার উত্তর না দিয়া চারুর সহিত নানা অর্থহীন কথা কহিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা ঘড়ির প্রতি চাহিয়া বলিলেন—

"ওঃ যাইবার সময় হইয়াছে। চারু, এলা, তবে চলিলাম"—এই বলিয়া আমার প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষে চাহিয়াই দ্রুতপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই দিদি আসিয়া আশার সহিত আমার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। আমি আর সে রুদ্ধ অশ্রুজল থামাইতে পারিলাম না, তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। স্নেহময়ীর চক্ষের জল আমার কেশে পড়িতেছিল।

সহসা মিঃ বসুর কণ্ঠস্বরে আমরা চমকিয়া উঠিলাম, তিনি দ্বারের নিকট আসিয়া বলিলেন—

"কি গো, এখনো তোমাদের হইল না?

গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে ; স্টুকো এত বিলম্ব দেখিয়া যাইতে ব্যস্ত হইতেছে।”

তাড়াতাড়ি সেই উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল মুছিয়া দিদি আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন।

গাড়ী গঙ্গার তীরে আসিয়া থামিল। আমরা নামিয়া পদব্রজে জেটি পার হইয়া জাহাজে প্রবেশ করিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে সকলকে লইয়া তাঁহার ক্যাবিন দেখাইতে চলিলেন। আমি ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সকল দ্রব্যের প্রতি চাহিলাম, সেই ত তাঁহার নিত্য ব্যবহারের সকল দ্রব্যই চলিয়াছে, কেবল আমি নাই। আর কিয়ৎক্ষণ পরেই ত সকল শেষ হইবে। কে জানে এ জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে কি না? ঈশ্বর কেন আমায় এই ঘোরতর পরীক্ষায় ফেলিলেন? শেষে কি হইবে কে জানে! এ জীবন কি শুধু প্রহেলিকা মাত্র? আর ত ফিরাইবার অবসর নাই। ফিরাইয়া কি হইবে? সমাজের লোকে জানিলে কি বলিবে? স্বামীর কলঙ্ক আমি একাই বহন করিব। কিন্তু এ যদি মিথ্যা হয়, তাহাই সম্ভব, তাহা হইলে তিনি আর আমায় কখনো ক্ষমা করিবেন না ; কিন্তু আমার দোষ কি? সাক্ষাৎ প্রমাণে কে না বিশ্বাস করিবে? যদি আজ আমি তাঁহাকে ভাল না বাসিতাম, তাহা হইলে আর এমন ভাবে হৃদয় বিদীর্ণ হইত না। সকলে মিলিয়া ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়া ডেকে আসিলেন। তখন প্রভাতের মৃদু আলোকে ধরণী জাগিয়া উঠিতেছিল, পূর্ব্ব দিক্ অরুণরাগে রঞ্জিত হইতেছিল, তখনো পশ্চিম প্রান্তে ম্লান শুকতারা নিবিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। অতি শীতল স্নিগ্ধ প্রভাত-বায়ু ঘুমন্ত তরঙ্গরাশিকে দুলাইতেছিল, দূরে শুভ্র গগনবক্ষে দুই একটি বিহঙ্গ উড়িতেছিল। মাঝে মাঝে সেই মধুর কাকলি শূন্যের বক্ষে ভাসিয়া আসিতেছিল। সে দিন সেই পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর বক্ষে কি আমার স্থান হইল না? যে একবার প্রাণ হারাইয়া সর্ব্বস্ব ভুলিয়া ভাল বাসিয়াছে, প্রণয়পাত্রকে ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যু তাহার পক্ষে অসম্ভব। আবার দেখা হইবে, আবার ভালবাসিবে, আবার সুখী হইব, সে এই আশাই হৃদয়ে পুষিয়া রাখে।

তিনি সেই জাহাজেই অতি প্রত্যূষে চা পানের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বেহারা চা দিয়া যাইলে পর তিনি সকলকে ক্যাবিনে আহ্বান করিলেন। এদিক্ ওদিক্ নানা কথায় চা পান শেষ হইবা-মাত্র জাহাজের প্রথম ঘণ্টাধ্বনি করিল, হুইসল দিল। তাড়াতাড়ি সকলে বাহিরে আসিলেন। আমি দূরে একটি রেলিং ধরিয়া সেই গঙ্গার স্নিগ্ধ জলরাশির প্রতি চাহিয়া রহিলাম, বিদায়ের পূর্ব্বে যদি একটি কথা—একবার সস্নেহ চাহনি পাইতাম, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতে পারিতাম।

জাহাজে দ্বিতীয় হুইসল দিবার পর সকলে দ্রুতগতিতে ডেক হইতে নামিতে

লাগিলেন, আমিও নামিতে লাগিলাম, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবারও অবসর ছিল না। সহসা কয়েক সিঁড়ি বাকি ছিল সকলে চলিয়া যাওয়ায় আমি যেমন অতি দ্রুত-পদে নামিতে যাইব, অমনি বস্ত্রাঞ্চল বাধিয়া পড়িয়া যাইবার মত হওয়াতে কে আমায় ধরিয়া ফেলিলেন। চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম তিনি। মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ের চক্ষু উভয়ের চক্ষে মিলিত হইল, উভয়ের হৃদয়ের অব্যক্ত যাতনা কি তাহাতে প্রভাসিত হয় নাই? তখনও তিনি আমাকে সেই ভাবে বাহু-পাশে ধরিয়াছিলেন, একবার হৃদয়ের নিকট টানিতে গিয়া, পুনরায় ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমায় ছাড়িয়া দিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেলেন।

আমরা তীরে নামিবামাত্র তৃতীয় হুইস্‌ল দিয়া জাহাজ ছুলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তীর ছাড়াইয়া দূরে যাইতে লাগিল। দেখিলাম সেই ম্লান মুখে ঈষৎ হাসিয়া তিনি রুমাল দুলাইতেছেন। আমার নয়ন কে যেন কুয়াসায় আবৃত করিল। দেখিতে দেখিতে জাহাজ নিমেষের মধ্যে অন্তরাল হইয়া গেল। আমরা গৃহে ফিরিলাম।

সেদিন পথে গাড়ীতে আমি মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলাম, গৃহে আসার পর ক্রমাগত কাঁপুনি ও দু একবার মূর্চ্ছা হইল। ডাক্তার আসিয়া নাকি বলিয়া গেলেন ইহা স্নায়ুর রোগ, ("Fainting fit"); বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। সেই রাত্রে সেই কম্পনের সহিত সেই জ্বরের ঘোরে সাতদিন অচেতন হইয়াছিলাম, আর ক্রমাগত তাঁহাকে ডাকিয়াছি। যখন আমার জ্ঞান হইল, আমি আকুল আগ্রহে তাঁহাকে দেখিবার জন্য চাহিলাম, দিদি আমার শিয়রে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতেছিলেন, আমি কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"কোথায় তিনি, কোথায়?"

"এলা, তুমি কি সব ভুলিয়া গেছ? সুকো যে বিলাত গেছে। এডেন হইতে তার এক-খানি পত্র আসিয়াছে, সে ভাল আছে।"

"ও" বলিয়া আমি একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলাম। তাহার পর একে একে আমার সমস্ত কথা মনে পড়িয়া গেল। পুনরায় মানসিক যন্ত্রণায় আমার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইল। দু সপ্তাহ সেই ভাবেই কাটিল। তাহার পর আমি রোগমুক্ত হইলাম। কিন্তু অতিশয় শীর্ণকায় ও দুর্ব্বল হইয়াছিলাম। দুই সপ্তাহ পরে একদিন বৈকালে আমায় বাতায়ন পার্শ্বে একটি ইজি চেয়ারে আনিয়া শোয়াইয়া দিল, এত দুর্ব্বল হইয়াছিলাম যে অঙ্গুলি নাড়িবার ক্ষমতা ছিল না। দিদি আমার ট্রাঙ্ক খুলিয়া একখানি শাল বাহির করিয়া আনিয়া যেমন আমায় ঢাকিয়া দিতে যাইবেন, অমনি একখানি চিঠি পড়িয়া গেল। তিনি উঠাইয়া লইয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—

"এলা, এ যে বিলাতের খাম। এইটা কি তোমরা খুঁজিয়াছিলে?"

আমি তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া দেখিলাম, সেইটাইত। খাম কোথা হইতে পোষ্ট করা হইয়াছে, তাহা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া বোধ হইল "কলিকাতা।" আমার মস্তক কেমন করিয়া উঠিল, অবসন্নহৃদয়ে কম্পিতহস্তে, সেখানি দিদির হস্তে দিলাম। তিনি দ্রুতপদে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার স্বামীকে দিতে চলিয়া গেলেন।

মিঃ বসু সে লেখা কাহার জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। স্বামীর বন্ধু সুরেশকে তিনি সমস্ত ভার দিলেন। তিনি? চারি দিকে বিশেষ অনুসন্ধান করাইতে লাগিলেন।

আবার এই দুঃখের সময় আমার এক নূতন উপসর্গ হইল। রমণী-জন্মের যাহা চির-আকাঙ্ক্ষিত কামনা, আমি সেই সন্তানের জননী হইব জানিতে পারিলাম। ক্রমে আমার একটু বল হইলে, পিসিমা আসিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার বাটীতে লইয়া আসিলেন।

একদিন বৈকালে লীলা (পিসিমার জ্যেষ্ঠা কন্যা) ও আমি বাগানে বেড়াইতেছিলাম। লীলার ছেলেটিকে আয়া কোলে লইয়া দূরে বেড়াইতেছিল। লীলা আমার আশৈশব সুখদুঃখভাগিনী হৃদয়ের বন্ধু। সে তাহার স্বামীর সহিত হুগলীতে থাকে, আমার কলিকাতা আসার সংবাদে সে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। তাহার স্বামী মিঃ দত্ত হুগলী কলেজের প্রোফেসার। লীলা আমায় কয়েকদিনের জন্য হুগলি যাইতে অনুরোধ করিতেছিল। আমার এ সময় কোন স্থানে যাওয়া অসম্ভব। স্বামীর পৌঁছান সংবাদ পর্য্যন্ত আসে নাই। সুরেশও অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল প্রাপ্ত হন নাই। আমরা বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় অবিনাশ দাদা একখানি খোলা টেলিগ্রাম আনিয়া আমার হস্তে দিলেন। আমি আগ্রহের সহিত পড়িলাম—

"নিরাপদে পঁহুছিয়াছি। আসা বৃথা হইল; সে নামের কোন চর্চ্চ (গির্জা) বা প্রিষ্ট (পুরোহিত) এখানে নাই। আমি শীঘ্র ডাইরেক্টরি পাঠাইব। বিনয়কে পত্র লিখিয়া সকল সংবাদ লইও।"

বিনয় অবিনাশ দাদার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কয়েক বৎসর শিক্ষার জন্য বিলাত গিয়াছে। কি আশ্চর্য্য, আমার নাম অবধি নাই। আমার নামেও আসে নাই, মিঃ বসুর নামে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। আমি ত একবারও দেশত্যাগী হইয়া, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কোন স্থানে যাইতে বলি নাই। বিলাত যাইবার কি প্রয়োজন ছিল? কলিকাতা হইতে কি অনুসন্ধান হইত না? যাইবার পূর্ব্বে আমায় একটি কথা কহিবারও অবসর দিলেন না। এই ভালবাসা? ভালবাসার ব্যক্তি অপরাধ করিলে কি তাহাকে ক্ষমা করিতে নাই? আমার কি দোষ? আমি কেমন করিয়া জানিব ইহা সত্য কি মিথ্যা? আমি ত তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বলি নাই। কয়েক দিবস মাত্র পৃথক্ থাকিতে চাহিয়া

ছিলাম। তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম, তিনি আমার মনের ভাব পর্য্যন্ত বুঝিলেন না। কত চিন্তা করিব, চিন্তার ও যাতনার কি সীমা আছে?

তাহার দুই দিন পরে একদিন দ্বিপ্রহরে দিদি গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন ও আমায় সেই মুহূর্ত্তেই যাইতে লিখিয়াছিলেন। আমি কত বিপদের আশঙ্কার পর উদ্বেলিত-হৃদয়ে—আশা নিরাশার ভীষণ আন্দোলনে তাঁহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম হলে বিষণ্ণ-ম্লান-মুখে দিদি বসিয়া আছেন, নিকটেই সুরেশ মজুমদার ও মিঃ বসু বসিয়া আছেন, উভয়ের আনন ব্যাকুল আগ্রহে পরিপূর্ণ। আমি যাইবামাত্র দিদি অশ্রুজড়িতকণ্ঠে কহিলেন—

"কি করিয়াছ এলা, বিনা দোষে সুকো নিতান্ত অপরাধীর মত চলিয়া গেল। কতবার নিষেধ করিলাম যাইতে দিও না, কিছুই শুনিলে না।

আমি ত আত্ম-বিস্মৃত হইয়া আকুল-নয়নে চাহিয়া রহিলাম। সুরেশ মজুমদার বলিলেন—

"এ সব দেবেন দত্তের কাজ।"

আমি ধীরে ধীরে কহিলাম—"কি কাজ? কোন্ দেবেন দত্ত?"

দিদি বলিলেন—

"দেবেন দত্তকে জান না? যে সেই সুকোর সঙ্গে বিলাত গিয়া সিভিলিয়ানে ফেল হয় ও পরে ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসে? সে যে এখন মস্ত বড় মানুষ, বাপের মৃত্যুতে অগাধ সম্পত্তি পেয়েছে।"

আমার মনে পড়িল। সে দেবেন দত্ত বিলাতের কুহকে পড়িয়া সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছিল। আমি পুনরায় বলিলাম—"তিনি কি করিয়াছেন?"

মিঃ বসু ক্রোধে বিকম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন—

"কি করিয়াছে? লক্ষ্মীছাড়াই ত সুকোকে দেশত্যাগী করাইয়াছে, তার সোনার সংসারে আগুন জ্বালাইয়াছে, তোমাকে এই যন্ত্রণা দিতেছে, সেই ত সেই চিটিখানা লিখেছে"—

"ওঃ" আর আমার বাক্য সরিল না, মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে হইল আমার প্রাণ শূন্যে ভাসিতেছে। আমি যেন সংসার হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। জড়বৎ অচল হইয়া রহিলাম। তাহার পর তাঁহারা যাহা বলিলেন, তাহার অর্থ এই—

"দেবেন দত্ত স্বামীর বন্ধু ছিলেন, ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে বাল্যকাল হইতে উভয়ে এক কলেজে পাঠাভ্যাস করিতেন, এবং উভয়ে একত্রে বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া দেবেন দত্তের স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল হওয়ায় স্বামী তাঁহার পিতাকে সাবধান করিয়া একটি পত্র দেন, তাহাতে দেবেন দত্তের পিতা অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ কঠিন হওয়ায় দেবেন দত্তের তাঁহার প্রতি সাতিশয় বিদ্বেষ জন্মে। সেখানে নানা সূত্রপাতে বিবাদ

করিয়া দেবেন দত্ত পৃথক্ বাসায় চলিয়া যান, এবং প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। পরে উনি সিভিলিয়ান হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন, দেবেন দত্ত কয়েকবার অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। তাঁহার পিতা ঘোরতর সমাজ-সংরক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন, পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গৃহে লইলেন। দেবেন দত্ত দেশে আসিয়া নিজের মন্দ স্বভাবকে সংযত করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়াছিল। বন্ধুর প্রতি বিদ্বেষ ভুলিতে পারেন নাই, তাই আমাদের বিবাহের পর এইরূপে প্রতিশোধ লইয়াছেন। সুরেশ মজুমদারের এক আত্মীয়ের সহিত দেবেন দত্তের বহুদিনের আলাপ। সেই আত্মীয় খামের লেখা দেখিয়া কেমন সন্দিগ্ধমনা হইয়া দেবেন দত্তের নিকট কথায় কথায় এই কথা ফেলিয়াছিলেন, এবং স্বামীর বিলাত-যাত্রার কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে দেবেন দত্তের দু একটি কথায় বুঝিতে পারেন যে, এ চক্রান্তের বিষয় তাঁহার অজ্ঞাত নহে। তাহার পর রাত্রে দেবেন দত্ত অতিরিক্ত সুরাপানে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন যে, তিনি সে পত্র স্বামীকে দেশান্তরিত করিবার জন্য ও প্রতিশোধ লইবার জন্য পাঠাইয়াছেন, ও সেই অচেতন অবস্থায় দেরাজ খুলিয়া সে নকলটাও বাহির করিয়া দেখান। সুরেশ মজুমদারের আত্মীয় কৌশলে সে লেখাটিও হস্তগত করিয়া আনিয়াছেন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কাশ্মীর-চিত্র।

যাত্রা।

আমি একটি গৃহ-পিঞ্জরাবদ্ধা বঙ্গমহিলা। দেশভ্রমণের ইচ্ছা বাল্যাবধি অত্যন্ত প্রবল। প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শন জন্য সর্ব্বদাই প্রাণ ব্যাকুল। এমন লোকের পক্ষে যখন প্রাসাদ-নগরী কলিকাতায় বাস ঘটিল, তখন কর্ত্তব্যের প্রবর্ত্তনায় জীবনের দিনগুলি কাটিতে লাগিল বটে, কিন্তু মানসিক স্ফূর্ত্তি ও স্বাস্থ্য অচিরেই বিদায় গ্রহণ করিল। কোনও সুবিখ্যাত কবি বলিয়া গিয়াছেন "দুঃখ কখনও একা আইসে না, কিন্তু শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আগমন করে।" শৈশবাবধি পিতা মাতার ও বন্ধু বান্ধবের অসীম আদর যত্নে প্রতিপালিতা এই প্রকৃতি-সেবিকা অসংখ্য পশুপক্ষীকে সঙ্গীভাবে গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে শৈশবের দোলায় দুলিতে দুলিতে শৈশব কৈশোর অতিবাহিত করিয়াছিল। হায়! অবোধ মন কুটিল ও উবর সংসারের

রীতি নীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা ছিল। ভাবিতাম সংসারে স্থধুই বুঝি গোলাপ ফুটে, চির-বসন্ত বিরাজিত, কোকিল-ঝঙ্কার মুখরিত। হায়, অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-গতিতে এই চমক ভাঙ্গিয়া গেল। একত্রে পরম শ্রদ্ধেয় ভালবাসার অনন্ত প্রস্রবণ জনক জননী বিদায় লইলেন, উজ্জ্বল নক্ষত্র সম ভ্রাতা ও সন্তানগণ অকালে বৃন্তচ্যুত ফুল্লকুসুমের ন্যায় কালের লৌহ-কর স্পর্শে ম্লান হইয়া শ্মশানভূমিতে মিলিয়া গেল। এ হতভাগিনীর পক্ষে সংসারের সকল চাকচিক্য ও আকর্ষণ চিরদিনের জন্য বিদায় লইল। সংসার বিষম কারাগার মনে হইতে লাগিল। যে "প্রাসাদ-নগরী" কলিকাতার জনতা ও বন্ধভাব সম্পদের সময় মনে আনন্দ বিতরণে অক্ষম ছিল, এখন এই ঘোর শ্মশান-বহ্নি বুকে রাখিয়া কোন মতে তথায় তিষ্ঠিতে পারি না। নিশি-দিন প্রাণ অনন্তের পথে উড়িবার জন্য অধীর হইয়া পড়িল। সহৃদয় বন্ধু চিকিৎসক মহাশয়ের অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করিয়া বারংবার বিষম জ্বরের ও মৃত্যুর আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু এ অভাগিনীর আশা সফল হইবার সুযোগ না দিয়া চিকিৎসক মহাশয় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আমাকে বাধ্য করিলেন। দেশ দেখিবার অর্থ যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা হইত, তবে পরমানন্দে সম্মত হইতাম। যখন শুনিলাম ইহা কেবল এ দুর্ভাগা জীবকে বাঁচাইবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নয়, তখন ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া অনাহার ও অনিদ্রায় দিন কাটাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। পরম-হিতৈষী চিকিৎসক মহাশয়কে ভয়ানক তিরস্কার করিলাম। কিন্তু তাঁহার ধীর শান্ত মধুর স্বভাব অটল রহিল। আমার অজ্ঞাতে পূর্ব্বাহ্নেই গাড়ী "রিসার্ভ" হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ঘোর অনিচ্ছায় ট্রেণ ছাড়িবার তিন কোয়াটার পূর্ব্বে ঊর্দ্ধশ্বাসে হাওড়া ষ্টেষণে ছুটিতে হইল। পশ্চাতে স্নেহপূর্ণ অবশিষ্ট কয়টী মায়ার পুতলী পড়িয়া রহিল বলিয়া বিচ্ছেদের আঘাতে ভগ্নপ্রাণ বিচূর্ণ হইল, বিষাদের তীব্র অশ্রু গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। শুনিলাম ভূতলের স্বর্গ কাশ্মীর আমার গন্তব্য স্থান। ১৮৯৫ সালের ২২এ সেপ্টেম্বর গ্রীষ্মধূলি ও মশকের উৎপাত পূর্ণ কলিকাতা সহর ত্যাগ করিলাম। সঙ্গে পাঁচটি সহযাত্রী যুটিলেন। অনেক দিন হইতে কবিগুরু মুরের "Who has not heard the vale of Cashmere" র চিত্ত-উন্মাদিনী কবিতা পাঠ করিয়া নন্দন কানন তুল্য গৌরবান্বিত হিমাচলের ক্রোড়ে লুক্কায়িত কাশ্মীর রাজ্যের অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাশি কল্পনা সাহায্যে ধ্যান করিয়া জীবন কাটাইয়াছি। আজ সেই সুখময় উপত্যকায় গমন করিতেও এত অনর্থ ঘটাইলাম। সময়ের একান্ত অল্পতা প্রযুক্ত এবং মনের অস্থির অবস্থার

জন্য সেই চির-তুষারাবৃত রাজ্যে ভ্রমণোপযোগী কোনও উপকরণ সংগ্রহ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। যে বস্ত্রাদির সংস্থান ছিল, একান্ত ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাহাও পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। ডাইরী (দৈনিক বিবরণ) লেখা আমার অভ্যাস। সেই নোটবুকখানা পর্য্যন্ত সঙ্গে আনিতে পারি নাই। শারদীয়া পূজার ছুটী আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, ট্রেণগুলিতে লোক ধরে না। হাওড়া ষ্টেষণের জনতা অতি ক্লেশে ভেদ করিয়া নির্দ্দিষ্ট শকটে স্থান গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কাশ্মীরের মনোহারী চিত্র হৃদয় উৎফুল্ল করিতে পারিবে, আমার অবস্থা সে প্রকার ছিল না। বিষণ্ণমনে, ঘোর দুশ্চিন্তার বোঝা লইয়া দুর্ব্বহ রুগ্ন দেহভার বহন করিতেছি, তাহার সচ্ছন্দতার জন্য সহযাত্রিগণ যত ব্যস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, হৃদয়ের ক্লেশভার ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভাবিলাম ইচ্ছাময় প্রভু যে কয়টী স্নেহের আকর্ষণ এখনও অবশিষ্ট রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পশ্চাতে ফেলিয়া আসা অতি গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। বাষ্পশকট কাহারও সুখ দুঃখের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। আমি যখন গাড়ীর এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া নীরবে বিষাদের অশ্রু ঢালিতেছি, এমন সময় সহযাত্রী মহাশয় অতি সুন্দর একখানি নোটবুক আনিয়া উপহার দিলেন। সেই মুহূর্ত্তে পঞ্জাব মেলট্রেণ বজ্র-গম্ভীর নিনাদে ধূমরাশি উদ্গীরিত ও ষ্টেষণগৃহ বিকম্পিত করিয়া গন্তব্য পথে ছুটিল। আত্মীয় বন্ধুগণ অভিবাদনপূর্ব্বক বিদায় লইলেন। এতকাল নগরের কোলাহলে রোগে শোকে ডুবিয়া প্রকৃতির নির্ম্মল লাবণ্যপূর্ণ উন্মুক্ত সুষমা উপভোগ করিবার সুযোগ ঘটে নাই, আজ এই কৌমুদী-বিধৌত নিস্তব্ধ শান্তিপূর্ণ যামিনীর শোভা দর্শন করিয়া বুকে যে শ্মশান-বাহ্ন জ্বলিতেছিল, তাহা কতক পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। প্রকৃতি সতীর শুভ্র প্রশান্ত সৌন্দর্য্য হৃদয়ে শত সুভাব কুসুম প্রস্ফুটিত করিয়া দিল। নানা ভাবের তরঙ্গে ডুবিয়া একবারও নিদ্রা আসিল না। হঠাৎ পূর্ব্বাকাশের আলোকচ্ছটা দর্শন ও বিহগকূজন শ্রবণ করিয়া চমকিত হইয়া দেখি যে, নিশা অবসান হইয়াছে। যাত্রার তৃতীয় দিনে আমরা বিন্ধ্যাচলের পাদমূল অতিক্রম করিয়া যে মনোহারী আরণ্যক দৃশ্য দর্শন করিলাম, তাহা অবর্ণনীয়। বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কালের লৌহময় হস্তের পরিচয় দিতেছিল। যাত্রার চতুর্থ দিনে আজ ২৫শে সেপ্টেম্বরে পঞ্চনদের রাজধানী লাহোর নগরীতে পৌছিবার দিন। মার্ত্তণ্ডদেব মধ্যাকাশ হইতে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ট্রেণ "কুরুক্ষেত্র" ষ্টেষণে পৌছিল। কুরুক্ষেত্র নামটী কর্ণে প্রবেশ মাত্রেই শত সহস্র বৎসরের সুদূর অতীতের জীবন্ত ছবি হৃদয়ে জাগাইয়া দিল। কুরু পাণ্ডবগণের বীর-দর্প-পূর্ণ সমরাঙ্গনের ভীষণ ক্রীড়া

চক্ষুর সম্মুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এত শৌর্য্য বীর্য্যের আকর বীরপুরুষগণ কাল-হস্তে আজ পৃথিবীর ধূলিতে মিশাইয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহারা কোথায়? এ কথা যত ভাবি, তত ঘোর উদাস ভাবে প্রাণ ডুবিয়া যায়। প্রচণ্ড-রবি-কিরণ-প্রদীপ্ত শ্যামলতা-বিবর্জ্জিত, অসীম কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর যেন সমরাঙ্গণের বিকট বীভৎস হাহা শব্দে ভীষণতা বিস্তার করিতেছিল। আমরা ধূলি-ধূসরিত-দেহে ভীষণ গ্রীষ্মতাপে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলাম। একটী সহযাত্রীর প্রায় সর্দ্দি-গর্ম্মি হওয়ার উপক্রম হইল। অনেক কষ্টে বরফ এবং সুবিখ্যাত এইচ, বসুর 'অপূর্ব্ব সিরাপ' মিলিল। সরবৎ দ্বারা তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলাম। ভাবিলাম ধূলিপূর্ণ বাষ্পশকট ত্যাগ করিলেই বুঝি ক্লেশের অবসান হইবে; কিন্তু পরিশেষে ইহা ভ্রমে পরিণত হইল। আহার অপেক্ষা স্নান অধিক আবশ্যক। চিরকাল আমি এই কুসংস্কারের অধীন। এ কয়দিন নানাভাবে শারীরিক ক্লেশে ও উদ্বেগে আহার পর্য্যন্ত হয় নাই, আজ এই লাহোর ষ্টেষণে ট্রেণ থামিবামাত্র বস্ত্রপূর্ণ ব্যাগটী হস্তে করিয়া ষ্টেষণের স্নানাগারের অভিমুখে ছুটিলাম। সহযাত্রী মহাশয় সময়-নিষ্ঠা (Punctuality) এবং সতর্কতার আদর্শ। আমি আবার তদ্বিপরীত জীব। তিনি আমার বন্যপ্রকৃতি অবগত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন এবং কয় মিনিটের সময় স্নানালয় হইতে বহির্গত হইতে হইবে, নোটবুকে তাহা লিখিয়া ষ্টেষণগৃহের বারান্দায় পাদচারণা করিতে লাগিলেন। আমার নিজের ঘড়িটী সঙ্গে, তাহার উপর অগাধ বিশ্বাস থাকাতে সহযাত্রী মহাশয়ের এত সতর্ক ভাব হাস্যরসের আবির্ভাব করিয়াছিল। আমি দরিদ্র বাঙ্গালীজাতীয় স্ত্রীলোক। সুশীতল জলপরিপূর্ণ প্রকাণ্ড স্নানগৃহের সুব্যবস্থা দর্শন করিয়া মনে মনে বলিলাম, "হে ইংরেজ, জগতে তুমিই ধন্য, কারণ সুখ সচ্ছন্দের উপায় উদ্ভাবনে তোমার মত পটু আর কে আছে?" পাঁচ মিনিটও হইয়াছে কি না সন্দেহ, ইতি-মধ্যেই ট্রেণ-যাত্রাসূচক ঘণ্টাধ্বনি হইল। সহযাত্রী দ্বারদেশে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আর্দ্রবস্ত্র-হস্তে, আলুলায়িত-কেশে যে ভাবে গাড়ীতে উঠিলাম, তাহা আমিই জানি। একটু ক্লান্তি দূর করিতে না করিতেই সহযাত্রি-দলের সমবেত অনুযোগবাণী আমায় অস্থির করিয়া তুলিল। তাঁহাদের বোঝা উচিত ছিল যে, যদি কেহ তিরস্কারের পাত্র হয়, তবে সে আমার ঘড়ি। কিন্তু নীরবে সকলই সহ্য করিলাম। ২৬শে সেপ্টেম্বর বুধবার, আজ প্রাতে রেলওয়ে ষ্টেষণের শেষ সীমা রাউলপিণ্ডিতে পৌঁছিলাম। রেলের পথ অতিক্রম করিলেই কষ্টের ভার লাঘব হইবে বলিয়া আমার ধারণা ছিল, সুতরাং কতক্ষণে বিষম ধূলিপূর্ণ গাড়ী হইতে অবতরণ করিব, কেবল তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কাশ্মীর-যাত্রী হইয়াছি বটে,

কিন্তু কোন্ পথে কি প্রকার যানে গমন করিতে হইবে, আমার সে অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। সুতরাং সকল বিষয়েই সহযাত্রীকে প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলাম। টোঙ্গা নামক অশ্ব-চালিত যানারোহণ পর্ব্ব আজ আরম্ভ হইল। এতটুকু গাড়ীতে নিজেদেরই উপবেশন অসম্ভব ব্যাপার মনে হইল। তাহার উপর প্রকাণ্ড বোঝার সমাবেশ কোথায় হইবে, তাহা ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণায় কুলাইয়া উঠিল না।

(ক্রমশঃ)।

জল ও হাওয়া।

(৪৪১-৪২ সংখ্যা—২২৮ পৃষ্ঠার পর)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবেন্দ্র বাড়ী পঁহুছিয়া প্রথমে পিতাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন পিতার সদা-প্রফুল্ল মুখ আজি গম্ভীর।

জীবেন্দ্র বলিলেন বাবা, খবর কি?

রায় মহাশয় বলিলেন "ভিতরে যাও।"

জীবেন্দ্র অন্তঃপুরে গিয়া মাতাকে প্রণাম করিলেন, দেখিলেন জননীর সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের উপর কি এক বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে।

জীবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কি?

মাতা কহিলেন "কর্ত্তার চিঠিতে ত সব জানিয়াছ, বাড়ীতেও সেইরূপ খবর। যাও ঐ ঘরে যাও। অনেকক্ষণ বধূমাতা তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।"

জীবেন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের কনকাভ করজাল সুনীতির শয্যার উপর পড়িয়া খেলা করিতেছে। পুষ্প-লতাপূর্ণ মারুত-হিল্লোলিত মুক্ত বনস্থলীর মধুর গন্ধ, মুক্ত বাতায়ন পথে প্রবেশ করিয়া সুনীতির গৃহ আমোদিত করিতেছে।

কোমল শয্যার উপর কোমল উপাধানে মস্তক রাখিয়া সুনীতি শয়ন করিয়াছিল। জীবেন্দ্র ধীরে ধীরে সুনীতির নিকটে গিয়া বসিলেন। স্বামীকে দেখিয়া সাধ্বী সুনীতির আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। বিরহ অন্তে মিলনের সুধাময় সুস্নিগ্ধ কনক রশ্মির সংস্পর্শে সুনীতির শুষ্ক অধরে প্রসন্ন নির্ম্মল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

জীবেন্দ্র দেখিলেন, মহিমা-জ্যোতিঃ ও স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য-সমলঙ্কৃত সেই উন্নত দেহ-লতা সৌরভবিচ্যুত শ্রীভ্রষ্ট ধুলিম্লান ক্ষুদ্র যূথিকার ন্যায় শোভাহীন। জীবেন্দ্র সেই শুষ্ক অধরে চুম্বন করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আপন হস্তে তপ্ত অশ্রুর স্পর্শানুভব-মাত্র সুনীতি বুঝিল জীবেন্দ্র কাঁদিতেছে।

আপনার শরীরের অবস্থা দেখিয়া তাহার নিজেরও সময় সময় কাঁদিতে ইচ্ছা হইত। তখনও তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু সে উথলিত অশ্রুজল কষ্টে সম্বরণ করিয়া স্বামীকে কহিল "কাঁদিতেছ ?"

জীবেন্দ্র কোন কথা কহিলেন না।

সুনীতি। দেখ, কাঁদিলে যদি কষ্ট যাইত, তবে তুমি কাঁদিয়া বাড়ী ঘর ভাসাইতে, আমি নিষেধ করিতাম না। কিন্তু কাঁদিয়া বিন্দুমাত্রও ফললাভ হইবে না। এত জানিতেছ, তবে কাঁদ কেন ?

জীবেন্দ্র কথা কহিলেন না। কেবল সুনীতির শীর্ণ হস্ত খানি বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

স্বামীর ক্রন্দন দেখিয়া সুনীতি আপন কর-পল্লবে চক্ষু আবরণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—"আমি মরিব। নিশ্চয়ই মরিব। যম আমাকে লইয়া শূন্যে মিশিয়া যাইবে। কোথায় রাখিবে ? অন্ধকারে না আলোকে ? সেখানে গেলে কি জীবেন্দ্রকে দেখিতে পাইব ? পাইব বৈকি। যমের বাড়ীতে কি অন্য কোন স্ত্রীলোক নাই ? অবশ্যই আছে। আমি দুদিনেই তাহার সঙ্গে বেশ ভাব সাব করিয়া লইব। তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে যাইব। সর্ব্বাগ্রেই ইন্দ্রের অমরাপুরী যাইতে হইবে। সেখানে নাকি মন্দার পুষ্প আছে ? তাহা কি আমাকে ছুঁইতে দিবে না ? কেন দিবে না, আমি ত জীবনে কোন পাপ কাজ করি নাই। আর যদি ছুঁইতে না দেয়, নাই বা দিল ? চাহিয়া লইব। মন্দার ফুলে বেশ করিয়া মালা গাঁথিব। আচ্ছা, মালা যেন গাঁথিব, সে মালা কার গলে দিব ? জীবেন্দ্রের। বাঃ বেশ, জীবেন্দ্র কোথায় ? তিনি ত আর আমার সঙ্গে যাবেন না। তিনি অতদিনে হয় ত আমাকে ভুলিয়া যাইবেন। কেন ভুলিবেন ? ভুলিবেন বৈকি। তিনি আমাকে ভুলিয়া আবার বিবাহ করিবেন। সুনীতি আর ভাবিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল, চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পরে আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

জীবেন্দ্র দেখিলেন, সুনীতি করপল্লবে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। জীবেন্দ্র ভাবিলেন, মৃত্যু আশঙ্কা করিয়াই সুনীতি কাঁদিতেছে। জীবেন্দ্র আপন দুঃখ ঢাকিয়া রাখিয়া কহিলেন "সুনীতি, কাঁদিতেছ কেন ? আমি যেমন করিয়া পারি, তোমাকে বাঁচাইব।" সুনীতি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "বাঁচাতে পার বাঁচাও, আর যদি বাঁচাইতে না পার তবে ?"

জীবেন্দ্রের চক্ষু দিয়া আবার জল ঝরিতে লাগিল।

সুনীতি কহিল "আমি একটি কথা বলি, তাহার ঠিক্ উত্তর দিবে ?"

জীবেন্দ্র চক্ষু মুছিয়া কহিল "বল, ঠিক্ উত্তর দিব।"

সুনীতি। আমি যদি মরিয়া যাই, তবে কি তুমি আবার বিবাহ করিবে ?

জীবেন্দ্র ক্ষণকাল নীরবে রহিয়া কহিলেন—"অমঙ্গলের কথা কেন, সুনীতি?"

সুনীতি। আমি অমঙ্গল সুমঙ্গল বুঝি না, তুমি আমার কথার ঠিক্ উত্তর দাও।

ঈশ্বর না করুন, তুমি যদি আমাকে ছাড়িয়াই যাও, তবে আর আমি বিবাহ করিব না। চিরকাল তোমার সুখময়ী স্মৃতিই আমাকে বাচাইয়া রাখিবে।

সুনীতির অশ্রু-মুখে হাসা রেখা দেখা দিল, তাহাতে তাহার সুধামাখা বদন অধিকতর মনোহর ভাব ধারণ করিল।

জীবেন্দ্র সেই অশ্রুগুচ্ছবিশিষ্ট নব অশোকলতিকার ন্যায় সুন্দরী স্ত্রীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"চিন্তা নাই, আমি জীবনে মরণে তোমারি। এখন একবার তোমার চিকিৎসা ও স্থান পরিবর্তনের ব্যবস্থাটা করিয়া আসি।"

জীবেন্দ্র উঠিয়া বাহিরে গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরে জীবেন্দ্র মাতা ও ছোট ভগ্নীসহ সুনীতিকে লইয়া গিরিডিতে গেলেন। ইহা সত্বেও দুই জন বিজ্ঞ চিকিৎসক সঙ্গে গিয়াছিলেন। রাস্তায় দুর্ব্বল রোগিণীর বিলক্ষণ কষ্ট হইয়াছিল। রোগিণীর সে কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত স্বামী যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবার ভগবান্ সকলেরই শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবেন্দ্র প্রিয়পত্নীকে লইয়া গিরিডিতে উপস্থিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গিরিডি সহরের বাহিরে সুশীতল উস্ত্রী নদীর তীরে জীবেন্দ্রর বাসা। জীবেন্দ্র আজ দুই মাস হয় গিরিডিতে আসিয়াছেন, এর মধ্যেই সুনীতির শরীরের অনেক উন্নতি হইয়াছে। তাহার এখন আর জ্বর হয় না, দারুণ পেটের পীড়াও একেবারে ভাল হইয়াছে। হস্ত পদের বিষম জ্বালা, সে এখন আর কিছুই অনুভব করে না। প্রথম আসিয়া সে বিছানা হইতে উঠিতে পারে নাই। এখন তাহার শরীরে অনেক বল হইয়াছে এবং সে এখন ননদিনী সুমালা ও স্বামীর সঙ্গে উস্ত্রী নদীর প্রস্তরময় বালুকা-ভূমিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কখন কখন সুবৃহৎ উপলখণ্ডে উপবেশনপূর্ব্বক নানারূপ হাস্যোদ্দীপক কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে।

গিরিডি সহর প্রাকৃতিক রম্য ভূমি। এখানে ছোট বড় পর্ব্বত, শালবন ও পরিষ্কার মাঠগুলির শোভা, অনির্ব্বচনীয়। গিরিডির আকাশের তারকামালা, অদূরবর্ত্তী কিম্বা সুদূরবর্ত্তী উচ্চ কিম্বা ক্ষুদ্র গিরিশিখর, সরল বৃক্ষ-শ্রেণী-সজ্জিত কাননের বৃক্ষলতা সমস্তই যেন শান্তি রাজ্যের মধুরিমা মাখা।

উস্ত্রী নদীর তীরে প্রস্তরখণ্ডের সংখ্যা নাই। আজ যেখানে পশু পক্ষীর পদচিহ্নবিশিষ্ট ভূমি দেখিয়া আসিবে, পনর দিবস পরে গিয়া দেখিবে সেই পদ-চিহ্নবিশিষ্ট ভূমিগুলি পদ-চিহ্নবিশিষ্ট প্রস্তর

হইয়া উঠিয়াছে। সে সব শোভা দেখিতে অতি সুন্দর। স্থানে স্থানে এরূপ মনোহারিণী শোভা আছে যে, দেখিলে আর সংসারে ফিরিতে ইচ্ছা করে না।

বসন্তকালে নব-পল্লবিত শাল, পলাশ প্রভৃতি পাদপশ্রেণী কস্তুরিকার মতনই সৌরভ বিস্তার করিতেছে। কোথাও তরুণ বৃক্ষগুলি পুষ্পচ্ছলে হাস্য করিতেছে। প্রস্ফুটিত মোয়া মুকুলের মধু ও গন্ধে লুব্ধ ভ্রমর ও ক্রীড়াবান্ বিহঙ্গ সকল মধুর স্বরে চারি ভিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

সুনীতি এখন রোগমুক্ত হইয়া বরষা-মুক্ত গোলাপ ফুলটির ন্যায় সুন্দরী হইয়াছে। সে এখন প্রত্যহ স্বচ্ছ স্নিগ্ধ-সলিলা উশ্রী নদীর জলে স্নান করিতে আসে, এবং নানা রূপ প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া যায়। এইরূপ উপবন নদীর শীতল বায়ু সেবন করিয়া সুনীতি অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। সুনীতির জীবনের আর কোন রূপ আশাই ছিল না, বিজ্ঞ ডাক্তারগণও জবাব দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিডি আসিয়া সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

গিরিডি অঞ্চল অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। এ স্থানের জল হাওয়া যেরূপ বিশুদ্ধ তাহাতে পুরাতন রোগীরা এখানে আসিয়া যে অচিরে আরোগ্য লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ধনিব্যক্তিরাও অতি কদর্য্য স্থানে গলিয়া পচিয়া মরিতে স্বীকার করেন, কিন্তু এরূপ স্থানে আসিতে চান না!!

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

ভারত সম্রাটের শুভ জন্মোৎসব।

আজি ৯ই নবেম্বর (২৩এ কার্ত্তিক) ভারত-সম্রাট ইংলণ্ডেশ্বর ৭ম এডওয়ার্ড ৬০ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ৬১ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। আজি সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র তাঁহার মঙ্গলোৎসব হইতেছে, আমরাও তাঁহার জন্য প্রার্থনা করি:—

হে রাজরাজেশ্বর অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বর, আমাদের নবসম্রাটের এই জন্ম মহোৎসবের প্রথম অনুষ্ঠানে তোমার শুভাশীর্ব্বাদ অজস্রধারে বর্ষিত হউক। আজি তুমি ইঁহার সহায় হও এবং ইঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া নিরাপদে রাজধর্ম্ম-পালনে সমর্থ কর। ইনি যেমন স্বর্গীয়া জননী দেবীর পদাঙ্কানুসরণে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, তেমনি ইনি তাঁহার সদ্গুণ সকলের অধিকারী হইয়া তাঁহার ন্যায় যশঃ-কীর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্য সম্পদের আস্পদ হউন্। আমাদের বর্ত্তমান সাম্রাজ্ঞীকে এবং রাজ-পরিবার ও রাজ-বংশস্থ সকলকে কুশলে রাখিয়া সম্রাটের সুখশান্তি বর্দ্ধিত কর। তাঁহাকে শুভবুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রদান কর, তিনি যেন আপনার গুরুতর কর্ত্তব্য ও

দায়িত্ব অনুভব করিয়া অবাধে ও অকুতোভয়ে দুষ্ট দমন ও শিষ্টপালন ব্রতে রত থাকেন। তাঁহার নিকট প্রজাদিগের সুখ আপনার সুখ ও প্রজাদিগের দুঃখ আপনার দুঃখ বলিয়া অনুভূত হউক। তাঁহার মন্ত্রী সকল সুমন্ত্রী হইয়া ধর্ম্মানুমোদিত সুপরামর্শ সকলই তাঁহাকে দান করুন্। তাঁহার কর্ম্মচারী সকল বিশ্বাসী ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়া আপনাপন কার্য্যভার ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ সুসম্পাদনে সক্ষম হউন্। সাম্রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ, রোগ, মহামারী, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি আধিভৌতিক, আধিদৈবিক আপদ বিপদ্ সকল নিবারিত হউক এবং সর্ব্বত্র কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও নীতি ধর্ম্মের উন্নতি হইয়া রাজা প্রজা সকলের কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হউক। বিক্টোরিয়া যুগের মহৎ ও শুভ অনুষ্ঠান সকল স্থায়ী ও উন্নতিশীল হউক এবং নবনব হিতকর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া নবসম্রাটের রাজত্ব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকুক। পৃথিবীর আর আর রাজ্য সকলের সহিত তাঁহার মৈত্রী ও সদ্ভাব পরিবর্দ্ধিত হউক এবং যাহাদের সহিত বিবাদ মনোবাদ ও শত্রুতা আছে, তাঁহার ঔদার্য্য ও সদাশয়তা গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহারাও মিত্ররূপে পরিণত হউক। হে শান্তিদাতা মঙ্গলবিধাতা! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের প্রিয় সম্রাট্ ইংরাজ মন্ত্রিসভা, ইংরাজ পার্লেমেণ্ট ও ইংরাজ সংবাদ পত্রাদির সহায়তায় পৃথিবীতে তোমার প্রেমের রাজ্য ও শান্তির রাজ্য সংস্থাপনের সহায় হউন্।

ঈশ্বরের নামাবলী।

(৪২২-২৩ সংখ্যা—৩৬৩ পৃষ্ঠার পর)।

খ, খনক, খনি, খ-পতি, খরতম, খরতেজা, খল-দলন, খলারি, খলু, খিল, খিলাখিলগতি, খেচরপতি, খেদহরণ খেদাতীত, খ্যাত, খ্যাতিকৃৎ, খ্যাতিভৃৎ।

গগনাধীশ, গগনশীর্ষ, গঠনহীন, গণ্যাগ্রগণ্য, গতশোক, গতি, গতিনাথ, গন্তব্য, গভীরতত্ত্ব, গম্ভীর, গম্যস্থল, গরীয়ান্, গর্ব্বহীন, গর্ব্বখর্ব্বকারী, গহ্বরেষ্ঠ, গাম্ভীর্য্যরত্নাকর, গুণনিধান, গুণনিধি, গুণাত্মন্, গুণত্রয়াতীত, গুণসাগর, গুণাকর, গুণী, গুপ্ত, গুপ্তধন, গুরু, গুরুর গুরু, গুরুতম, গুহাহিত, গুহাশয়, গূঢ়, গূঢ়াত্মা, গৃহদেবতা, গেহহীন, গোবিন্দ, গৌরবাস্পদ, গ্লানিহর, গ্লানিহীন।

ঘটক, ঘন, ঘনজ্ঞান, ঘনানন্দ, ঘোর, ঘোররূপী, ঘোরপাপ-নাশন।

সত্যশতকম্।

(৩৮ সংখ্যা—৯৫ পৃষ্ঠার পর)।

সত্যং সনাতনং সর্ব্বৈঃ সেবনীয়ং সদা মুনে।
সত্যমেব পরোবন্ধু পিতা মাতা পিতামহঃ ॥১১

সকলের সেব্য সদা সত্য সনাতন,
পিতা মাতা পিতামহ সত্য বন্ধুজন।

সত্যে সম্পদ্বিপৎ সত্যরাহিত্যো ব্যর্থজীবনং।
সত্যে মতিঃ পরোলাভস্তস্য হ্যপচয়োঽন্যথা ॥১২

সত্যেই সম্পদ, সত্য বিনা বৃথা প্রাণ,
সত্যে লাভ, সত্য বিনা ঘটে অকল্যাণ।

প্রিয়ং সত্যঞ্চ পথ্যঞ্চ বদেদ্ধর্ম্মার্থমেবচ।
অশ্রদ্ধেয়মসত্যঞ্চ পরোক্ষং কটুচোৎস্বজেৎ ॥১৩

বলিও ধর্ম্মার্থে সত্য প্রিয় হিত কথা,
কটু মিথ্যা ব'লে কাকে নাহি দিও ব্যথা।

সত্যোনাস্যাদ্যতে শ্রেয়ঃ সত্যং হি পরমং পদম্।
সত্যে হি সতি সিধ্যন্তি গুণাঃ সর্ব্বে ফলোদয়াঃ ॥১৪

সত্যে শ্রেষ্ঠ পদ মিলে আশা পূর্ণ হয়,
সত্য রক্ষা হ'লে কার্য্য সফল নিশ্চয়।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥১৫

দীনে দয়া রিপু বশ সত্য ব্রত যার,
সে পারে করিতে জয় সমস্ত সংসার।

যস্য প্রতিষ্ঠা সত্যেঽস্তি তং ক্রিয়াফলমাশ্রয়েৎ।
তস্মাৎ সত্যন্ত বক্তব্যং জানতা সত্যমঞ্জসা ॥১৬

সত্যবাদী মানবের ক্রিয়া সিদ্ধ হয়,
দিও না হৃদয়ে তাই মিথ্যার আশ্রয়।

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধাঃ,
ন বৃদ্ধাস্তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
ধর্ম্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি,
সত্যং ন তৎ যচ্ছলমভ্যুপৈতি ॥১৭

যে সভায় বৃদ্ধ নাহি, সভা সেত নয়,
ধর্ম্মহীন বৃদ্ধে বল কিবা ফলোদয়?
সত্যহীন হ'লে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম সেত নয়,
নহে সত্য করে যাহা খলতা আশ্রয়।

কঃ কুলকমলদীনেশঃ
সতি বিভবেঽপি যো নম্রঃ।
কস্য বশে জগদেতৎ
সত্য-প্রিয়-বচনস্য ধর্ম্মনিরতস্য ॥১৮

কুলশ্রেষ্ঠ কেবা? যেবা বিভবে বিনত,
কার বাধ্য এ সংসার,
বল কে সে গুণাধার,
প্রিয়ভাষী? সত্যবাদী যেবা ধর্ম্মরত।

মৌনং মূর্খেষু স্ত্রীষু পাতিব্রত্যং সুভূষণম্,
অনন্যভক্তির্ভৃত্যেষু হিতোক্তিশ্চ মন্ত্রিষু।
সভ্যেষ্বপক্ষপাতস্তু তথা সাক্ষিষু সত্যবাক্;
মহা ছর্ভূষণং চৈতৎ বিপরীতমমীষুচ ॥১৯

মৌনে মূর্খ পাতিব্রত্যে শোভে নারীগণ,
সদুক্তিতে মন্ত্রী, ভক্তিব্রতে ভৃত্যগণ;
সুবিচারে সভ্য, সাক্ষী শোভে সত্যবলে,
এ সবার বিপরীতে নিন্দয় সকলে।

অনুগ্রাহক গ্রাহক।

বামাবোধিনীর কিঞ্চিদূন ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে অনেক সদাশয় গ্রাহকের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রতি ইনি চির-কৃতজ্ঞ। সম্প্রতি

একটী গ্রাহকের অসাধারণ অনুগ্রহে আমরা চমৎকৃত ও পরমানন্দিত হইয়াছি এবং আজি তাহার বিশেষ উল্লেখ করিব। সচরাচর সংবাদপত্রের ৩।৪ বৎসরের মূল্য যাঁহাদিগের নিকট প্রাপ্য থাকে, তাঁহারা হয় কাগজ বন্ধ করিতে বলেন, নয় কাগজ রীতিমত পান নাই বলিয়া নানা ওজর আপত্তি করেন; অথবা ২।১ বৎসরের মূল্য দিয়া বাকী ক্রমে ক্রমে দিবেন বলিলেই যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ হইল মনে করেন, আমরাও সেইরূপ মনে করিয়া থাকি। এই গ্রাহকটী কার্য্যগতিকে মূল্য দিতে না পারায় ৪ বৎসরের বাকী পড়িয়াছিল, এ জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া কেবল সেই প্রাপ্য মূল্য সমগ্র দিয়াছেন তাহা নহে; কিন্তু আবার আগামী ৪ বৎসর কালের মূল্য অগ্রিম স্বরূপ জমা দিয়াছেন। কি সহৃদয়তা, কি সৌজন্য, কি সরল বিশ্বাস! দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। অবশ্য আমরা যদি গ্রাহকদিগের নিকট ৪ বৎসরের বাকী ফেলিয়া রাখিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, তাঁহারা কি আমাদের প্রতি সেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না? কিন্তু এখনকার বুদ্ধিমান্ লোকে এরূপ ব্যক্তিকে বিদ্যা-বুদ্ধিহীন বালক বা নির্ব্বোধ ভাবেন। আমাদের গ্রাহক কিন্তু সে শ্রেণীর লোক নন। তিনি একজন কৃতবিদ্য, বয়স্ক, বহুদর্শী, বি এল উপাধিধারী উচ্চতর আদালতের প্রসিদ্ধ উকীল। এরূপ ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তিনি অবশ্য বিশেষ বিবেচনার সহিত করিয়াছেন। তিনি আপনার ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনার উপরে এই দণ্ড গ্রহণ করিয়া বামাবোধিনীকে কতদূর অনুগৃহীত করিয়াছেন! আমরা এরূপ দৃষ্টান্ত এই প্রথম দেখিলাম, এ জন্য গ্রাহক বন্ধুকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করিতেছি এবং আশ্বাস দিতেছি, তাঁহার সাধু দৃষ্টান্ত তাঁহার পরিতাপের কারণ হইবে না। আমাদের 'রাজভোলা' গ্রাহকগণ এই দৃষ্টান্তের স্বল্প মাত্রাও অনুসরণ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডেশ্বর ও ভারত-সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ডের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র মঙ্গল প্রার্থনা হইয়াছে। জগদীশ্বর আমাদের প্রিয় সম্রাটকে দীর্ঘজীবী করিয়া সুখে শান্তিতে রক্ষা করুন।

২। রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জন ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। লেডি কুর্জ্জনকে সঙ্গে লইয়া আগামী ১৮ই ডিসেম্বর কলিকাতায় উপনীত হইবেন।

৩। কাবুলের মৃত আমীর আবদুর রহমনের সিংহাসনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাবিবুল্লা খাঁ অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি ইনি খুব অনুরক্ত।

৪। গত ১লা নবেম্বর বুয়ার সেনাপতি বোথা বহুসংখ্যক সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্যের সহিত ইংরাজ সেনাপতি বেনসনকে নিহত করিয়াছেন। বুয়ারেরা এখনও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে।

৫। চীনের সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ লিহংচঙের মৃত্যু হইয়াছে। চিনের ঘোর বিপদ্ সাগরে ইনি কর্ণধার ছিলেন।

৬। ভারতের সীমান্ত দেশের কতকগুলি স্থান লইয়া একটি নূতন প্রেসিডেন্সি গঠিত হইতেছে, ইহার নাম "উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ" হইবে। রাজপ্রতিনিধির অধীন একজন চিফ কমিশনার ইহার শাসনকর্ত্তা হইবেন।

৭। ভারত সন্তানদের মধ্যে আমীরুদ্দীন কামীরুদ্দীন আবদুল লতিফ নামক একজন মুসলমান এবং কামাভাতৃদ্বয় এবারকার সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিন জনেই বোম্বেবাসী।

৯। দুরারোগ্য শারীরিক পীড়া বশতঃ কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এম এ বেথুন কলেজের লেডী প্রিন্সিপাল পদ ত্যাগ করিয়া পেনসন লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কুমারী সুরবালা ঘোষ বি, এ, আপাততঃ তাঁহার স্থানে কার্য্য করিতেছেন। চন্দ্রমুখীর সময়ে কলেজ যেরূপ অভূতপূর্ব্ব উন্নতি ও গৌরব লাভ করিয়াছে, তাহার জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

৮। প্রেসিডেণ্ট ম্যাককেনলীর হত্যাকারী জলগর্জের প্রাণ বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা বিনষ্ট করা হইয়াছে।

১০। বিলাতের প্রসিদ্ধ কেন সাহেবের সহকারী জন স্মেডলী মাদক নিবারণের সহায়তার জন্য ভারতে আসিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ত্রিবেণী—বাণীব্রত অধরচন্দ্র দাস প্রণীত—মূল্য ১৷৹ টাকা। আমরা এই উপন্যাস গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। চৈতন্য দেবের অভ্যুদয়সময়ে হিন্দু সমাজের যে প্রকার অবস্থা ছিল, ইহাতে তাহা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। গার্হস্থ্য চিত্রগুলি এরূপ নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিতে করিতে একটী জীবন্ত দৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে জাগিয়া উঠে। বর্ণনাগুলি আর একটু সংক্ষিপ্ত হইলে অধিক মনোহারিণী হইত। গ্রন্থকার সম্পূর্ণ উৎসাহ লাভের যোগ্য।

২। সরমার সুখ—শ্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। এইরূপ উপন্যাস গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা দেখিতে চাই। ইহার ভাষা যেমন সরল ও বিশুদ্ধ, চিত্রগুলি সেইরূপ জীবন্ত এবং নীতিও জনসমাজের পক্ষে কল্যাণকর। গ্রন্থের নায়িকা সরমা অভাগিনী চিরদুঃখিনী

কুলীন-ব্রাহ্মণ-কন্যা—সকল বিপদ্ পরীক্ষার মধ্যে আপনার চিত্তকে সংযত ও চরিত্রকে নির্ম্মল রাখিয়া দেবী জীবনের সৌন্দর্য্য দেখাইতে দেখাইতে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সহোদর নগেন্দ্র ও প্রণয়ী সুরেশচন্দ্রও উন্নতচরিত্রের লোক। পাপ চক্রান্তকারীদিগের পরিণাম কি বিষময়, তাহাও এই পুস্তকে সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সুবিজ্ঞ ও সুদক্ষ লেখক। গীতি কবিতায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, উপন্যাস ক্ষেত্রেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবেন সন্দেহ নাই।

বামারচনা।

বিজয়া সম্ভাষণ।

এস সখী সবে ভগিনী-প্রতিম,
কাছে এস আজি আনন্দ অসীম।
শারদ জোছনা সোণার আলোকে,
করি কোলাকুলি পরম পুলকে।
ধুয়ে ফেলি এস মান অভিমান—
কে আপন পর, সবাই সমান।
প্রেমে মাথামাথি হোক সব প্রাণ,
বিজয়া-মিলন এই অভিজ্ঞান।
বহুক প্রেমের সিন্ধু স্রোতস্বান্,
ভুলি জাতিভেদ ধর্ম্ম-ভেদ জ্ঞান।
আমরা যে এক জননী সন্তান,
শক্তিময়ী দেবী সর্ব্বত্র সমান।
স্বরগে মরতে সম জোতিষ্মান্
যে আনন্দে আজি ধরা ভাসমান।
বিজয়ার দান বাড়ায় সম্মান,
বিজয়ার দান কল্যাণ-নিদান,
বিজয়ার দান প্রেমের উৎসব,
বিজয়া মিলন স্বর্গের বৈভব—
লহ লহ বোন মিনতি আমার
রাখিও স্মরণে শুভ উপহার—
দেবীর কল্যাণ আশীষ এবার।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

দুর্গোৎসব।

সারা বরষের পরে মা তুমি এলে কি ঘরে?
এস গো আঁধার বঙ্গে দশদিক্ আলো করে।
শুন মাগো ভক্ত-কণ্ঠে উঠে তব স্তুতি গান,
মঙ্গল আরতি বাজে মাতায়ে অযুত প্রাণ।
ওই মা তোমার ভক্ত সচন্দন অর্ঘ্য লয়ে,
দাঁড়ায়ে তোমার দ্বারে ভকতি-পূর্ণ হৃদয়ে;
মিটাতে ও পদতলে সারা বরষের সাধ।
কর মা কর মা সবে তব শুভ আশীর্ব্বাদ।
কিন্তু মা করুণাময়ী, একি গো করুণা তব
তোমার চরণ পাশে কেন এই আর্ত্তরব?
কেন মা রঞ্জিত রক্তে তোমার পবিত্র দ্বার?
তোমার পুজারীহায়! এই কি মা উপচার!
নাশিয়া মা অসহায় কোটি কোটি শিশুজীবে
মিটে কি গো তৃষা তোর? হয় কি আনন্দ শিবে?
রুধির-পিপাসু তুই সত্য কি মা বল বল?

না, না, না তা নহে কভু, শুধু ভ্রান্তি ও সকল।
শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে কত যুগ এই মত—
হায়! মা ধরণী-বক্ষ হইতেছে কলঙ্কিত।
চির-স্নেহ-লীলা দেবী সবে মা তোমারে কয়,
তুমি চাহ জীব-রক্ত একি গো সম্ভব হয়?
এ পূজাতে পরিতৃপ্ত—তুষ্ট যদি নাহি হবে,
অন্ধ বিশ্বাসীর ভুল দাও মা ভাঙ্গিয়া তবে।
উঠুক সহস্র কণ্ঠে তোমার মঙ্গল গান,
এ ভ্রান্তি জগৎ হ'তে হোক্ চির অন্তর্দ্ধান॥

শ্রীসরোজিনী দেবী,
ধুবড়ী, গৌরীপুর।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া।

আজি এই শুভ দিনে শুভ সমাচার,
অনাবিল, স্বার্থ-শূন্য,
সুপবিত্র, স্নেহপূর্ণ,
ভগিনীর নিমন্ত্রণ ভাতৃ-দ্বিতীয়ার।
ভুলি বিঘ্ন ভুলি বাধা,
সুবিমল স্নেহ সুধা,
ভ্রাতারে ভগিনী আজি করিবে অর্পণ;
ভ্রাতা ভগ্নী প্রাণে প্রাণে,
মিলে মিশে একসনে,
সুদৃঢ় করিবে আজি প্রাণের বন্ধন।
জগতে যাঁহার নাম,
প্রেমসিন্ধু, শান্তিধাম,
যাঁহার সৌন্দর্য্যে—স্নেহে পূর্ণ বিশ্বধাম,
প্রেমের মহা মিলন,
যাঁর এ বিশ্বভুবন,
তাঁহারি করুণাবলে স্মরি সেই নাম।
মধুর সুন্দর অতি,
হৃদয়ের পূত প্রীতি,
আজি ভাই শুভ দিনে করহে গ্রহণ;
ভগিনীর এ সম্মান,
বিশ্ব-বিধাতার দান,
ভ্রাতার মঙ্গল তরে ভগিনী-জীবন।
সস্নেহে সাদরে ভগ্নী,
ভ্রাতার মঙ্গল গণি,
অর্পিবে মিষ্টান্ন মুখে, ললাটে চন্দন;
আহা কি পবিত্র প্রীতি,
সুমধুর স্নেহ স্মৃতি,
যে মহান্ স্নেহ মন্ত্রে "শমন দমন।"
অন্যের নাহি এ শক্তি,
অপার্থিব অনুরক্তি,
ভাই বিনা কে লইবে ভগ্নী-স্নেহ-দান?
ভ্রাতার মহোচ্চ প্রাণ,
ভগিনীর ক্ষুদ্র দান,
লইবে কি নাহি আজি ভুলে আত্ম-মান?
ভগিনীর ক্ষুদ্র শক্তি,
ভগিনীর স্নেহ ভক্তি,
যাচে চির নিশি দিন ভ্রাতার কল্যাণ;
জগতের নারীনর,
সহোদরা, সহোদর,
জাগিতেছে প্রাণে আজি এই দিব্য-জ্ঞান।
বিশ্ব-মার আশীর্ব্বাদে,
শুভ দিনে নির্ব্বিবাদে,
স্নেহের চন্দন বিন্দু, প্রীতির মিষ্টান্ন,
স্মৃতি-থালা পূর্ণ করি,
বিনয়ের হস্তে ধরি,
দিব আমি, কে নেবে কে? এস ইচ্ছা যার,
ভগিনীর নিমন্ত্রণ, ভাতৃ-দ্বিতীয়ার।

শ্রীমতী রেবা রায়, কটক।

ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর স্মৃতি।

রোগের যাতনা ভুলি সুখেতে হে প্রিয়তম,
পিতার শীতল কোলে যাও নিদ্রা দেবোপম!
আমি বাসিতাম ভাল হৃদয় ভরিয়া,
তাই সখা চলে গেলে কিছু না বলিয়া!
থাক ভাই হোথা সুখে দিব না ব্যাঘাত,
ভাঙ্গিতে এ ঘুম নাই সংসারের হাত।
ভাই, শিশুসম নির্ভয়েতে সুখে ঘুমাইছ,
সংসার ঝটিকা কোথা, কিছু না জানিছ।
ভাই, আমা সম তোমাকে যে না হবে কাঁদিতে,
সংসারের পাপ তাপ না হবে সহিতে।
যত দিন সঙ্কীর্ণতা থাকিবে হৃদয়ে,
তত দিন কাঁদি মোরা মোহে মগ্ন হয়ে।
যে দিন হেরিব চোখে ত্রিদিবের ভাতি,
জাগিবে মলিন প্রাণে সুপ্রভাত-জ্যোতি;
পাপ তাপ অবসানে যবে এ হিয়ায়,
বহিবে বিশুদ্ধ স্নিগ্ধ বসন্তের বায়;
গৌরব মুকুট যবে ধর্ম্মরাজ দিবে,
ভাই, সে দিন আনন্দে আত্মা তোমাকে হেরিবে॥ স্ব

দশমহাবিদ্যা।

কালী কালহরা মাগো, ধরিয়াছ নাম,
করি মা তোমার পদে অসংখ্য প্রণাম।১
তারা ত্রিনয়না মাগো ত্রিতাপহারিণি!
তনয়া যুগল পদ বন্দে গো তারিণি।২
ষোড়শী শর্ব্বাণী হও নিদানে সাক্ষাৎ,
ষড়ানন-মাতৃপদে করি প্রণিপাত।৩
ভুবনেশ্বরী মা ভব-ভয়-বিনাশিনী;
ভয়ে ভীত হয়ে বন্দি চরণে ভবানী।৪
ভৈরবী মা ভবার্ণবে কর গো উদ্ধার,
ভরসা চরণে তব, করি নমস্কার।৫
ছিন্নমস্তা শ্রীচরণে লয়েছি শরণ,
ছেদ কর কর্ম্মপাশ মায়ার বন্ধন॥৬
বগলা ব্যাকুল মা বিষয়-বিষ পানে,
ব্যথিত হইয়া সদা বন্দি ও চরণে॥৭
মাতঙ্গি! মা মত্ত মন ভ্রমে অনিবার,
ক্ষমা কর অপরাধ, করি নমস্কার।৮
কমলা কমল পদে রাখি দীন জনে।
কাতরা রমণী বন্দে অভয় চরণে॥৯
ধূমাবতী-বিদ্যা পদে প্রণতি আমার,
মম দোষ ক্ষমা ক'রে করো মা নিস্তার।১০

শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী,
ব্যাহরাইচ (আউধ)।

** অনেক যত্নে বামাবোধিনীকে নিয়মিত করা গিয়াছে। এখন নিয়ম রক্ষার আশা ভরসা গ্রাহক গ্রাহিকাগণের স্নেহ ও অনুগ্রহের উপর। সকলে আপনার আপনার দাতব্য অগ্রে দিয়া বামাবোধিনীর উন্নতির সহায়তা করুন। বামাবোধিনী প্রাণপণ সেবা দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তোষ বিধানে ত্রুটি করিবেন না। বা, বো, স।

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৯ বর্ষ। ৪৪৪-৪৫ সংখ্যা। { পৌষ, মাঘ—১৩০৮। } ৭ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দেশীয় বস্ত্রালঙ্কার—আমাদের বড়-লাট-পত্নী লেডী কুর্জ্জন কতকগুলি ভারতীয় পোষাক ও অলঙ্কার লইয়া আমাদের বর্ত্তমান সাম্রাজ্ঞী মহারাণী আলেকজাণ্ড্রার সহিত সাক্ষাৎ করেন, মহারাণী তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া এ-দেশীয় পোষাক ও গহনা নিজের জন্য চাহিয়াছেন।

আমরা ভারতবাসী বিলাতী সকল বস্তুর জন্য লালায়িত; কিন্তু দেশীয় জিনিসের গুণ ও সৌন্দর্য্য ভারত-সাম্রাজ্ঞী অনুভব করিয়াছেন, ইহা আমাদের সামান্য সন্তোষ ও গৌরবের কারণ নয়।

নূতন উপাধি—ভারত সম্রাটের জন্মোৎসবে বাঙ্গালীদিগের অল্প লোকেই সম্মান পাইয়াছেন, কিন্তু আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, পুঁটিয়ার রাণী হেমন্ত কুমারী দেবীকে এই উপলক্ষে "রাণী" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী ও শরৎসুন্দরীর মত সদ্গুণবত্তা ও বদান্যতাগুণে কবে ধনাঢ্যা বঙ্গমহিলা-গণ আবার "মহারাণী" উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইবেন?

পেনেল বিচার—গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত জজ পেনেলকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া সিবিলিয়ান পদ হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন। এখন এই বিষয় পার্লেমেণ্টে উঠিয়া শাসন ও বিচার কার্য্যের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা হইবে, শুনা যাইতেছে।

এই আন্দোলন দ্বারা যদি শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য সংসাধিত হয়, তাহা হইলে অনিষ্ট হইতে একটী ইষ্টলাভ হইল বলিতে হইবে।

দীর্ঘজীবী মনুষ্য—আলবেনিয়ার খুটীগ্রামের ইস্মেল হজো বর্ত্তমান যুগে স্থবিরতম ছিলেন। তিনি ১৬০ বৎসর বয়সে ২০০ উত্তরাধিকারী রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। আশ্চর্য্য এই বয়সে তাঁহার সকল দন্ত ছিল এবং মনোবৃত্তির বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই।

সভ্যতার কাল ছায়া—বোম্বাই টাউন হলে "Woman's Christian Temperance Association" নামক মহিলা-সমাজের উদ্যোগে সমুদায় মাদকনিবারণী সভার এক মিলিত অধিবেশন হয়। বিবী ষ্টিফেন্স সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং রেবারেণ্ড বোচেন বিংশ শতাব্দীতে "সভ্যতার কাল ছায়া" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা যে ধর্ম্মমূলক নহে, তাহা বর্ত্তমান সভ্যতম জাতিদিগের অর্থ-লালসা ও নর-শোণিত-পিপাসায় প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রেমের রাজ্য এখনও বহুদূরে। সে রাজ্য না আসিলে সভ্যতার চাক্‌চিক্যের মধ্যে ঘোর অন্ধকার।

ইউরোপ ও আসিয়ার সভ্যতা—ইউরোপীয়েরা আপনাদের সভ্যতাভিমানে স্ফীত হইয়া আসিয়ার সভ্যতাকে 'অসভ্যতা' বা 'অর্দ্ধসভ্যতা' বলেন। সম্প্রতি একটী ইংরাজ লেখক আপনার পুস্তকে এইরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করাতে পরমহংস রামকৃষ্ণ-শিষ্যা কুমারী নিবেদিতা (Miss Noble) বিলাতের এক সভায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, ইউরোপের সভ্যতা অর্থমূলক, কিন্তু আসিয়ার সভ্যতা নীতি ও ধর্ম্মমূলক।

বৈদ্যুতিক ট্রাম—ট্রাম গাড়ী ঘোড়ায় টানিত, পরে বাষ্প দ্বারা চালিত হইত, এখন বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনেক স্থানে চালিত হইতেছে। আগামী মার্চ্চে কলিকাতা হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত এইরূপ ট্রামের ব্যবস্থা হইবে।

গ্রহণ—এ বৎসর ঘন ঘন গ্রহণ হইতেছে—কোজাগর পূর্ণিমায় দিন চন্দ্র-গ্রহণ এবং শ্যামাপূজার অমাবস্যায় সূর্য্য-গ্রহণ হইয়াছে। জ্যোতিষীরা এরূপ গ্রহণ অমঙ্গলের কারণ বলিতেছেন।

প্রথম ছোটলাট—বঙ্গদেশের সর্ব্ব-প্রথম লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ফ্রেডারিক হালিডে ৯৫ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইনি সহৃদয় লোক ছিলেন এবং এ দেশের হিতকর অনেক কার্য্যে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির সহায় ছিলেন। ইহাঁর স্মরণার্থ কিছু করা কর্ত্তব্য।

উচ্চ বেতনের পাচক—রুসীয় সম্রাটের সর্ব্বপ্রধান পাচক মহাশয়ের মাসিক বেতন প্রায় ১২॥০ সাড়ে বার হাজার টাকা। আমাদের ছোটলাট অপেক্ষা ইহাঁর পায়া কম ভারী নয়!!

ছাত্রের পুরস্কার—সুপ্রসিদ্ধ সিনিয়ার রাঙ্গলার পারাঞ্জপের গুণের পুরস্কারার্থে তাঁহাকে সেণ্ট জন্স কলেজের ফেলো (সভ্য) করা হইয়াছে।

পার্লেমেণ্ট অধিবেশন—বুয়ার যুদ্ধে অধিক অর্থ আবশ্যক হওয়াতে পার্লেমেণ্ট আগামী ১৬ই জানুয়ারি খুলিবে।

আর্য্য-সমাজে অসবর্ণ বিবাহ—গত ৯ই নবেম্বর ক্ষত্রিয়বংশের লালা মুন্সী-রামের কন্যা শ্রীমতী হেমন্তকুমারীর সহিত অরোরা-বংশের শুকদিওর শুভ বিবাহ হইয়াছে।

আর্য্যসমাজে এরূপ ঘটনা এই প্রথম। আর্য্য-সমাজ যখন একেশ্বরের উপাসক এবং জাতিভেদ স্বীকার করেন না, তখন ব্রাহ্ম-সমাজের ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে সমাজসংস্কার-স্রোতঃ যে দ্রুত-বেগে চলিবে, এখন তাহা অবশ্যই আশা করা যায়।

এম, এম বসুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল স্কুল—স্বর্গীয় ডাক্তার মোহিনী মোহন বসুর স্মরণার্থ তাঁহার স্থাপিত স্কুলের এই নাম হইয়াছে এবং ডাক্তার জে এন্ ঘোষ, এম ডি, ইহার অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কার্য্য সুনির্ব্বাহের জন্য একটী কমিটি হইয়া সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা হইয়াছে।

সর্পদংশনের ঔষধ—পণ্ডিতা রমা বাইয়ের কয়েকটী ছাত্রীকে সর্পে দংশন করিয়াছিল, তিনি কেরসিন তৈল মালিস ও ভক্ষণ করাইয়া সকলকেই আরোগ্য করিয়াছেন। এই ঔষধ দৈবজ্ঞানে (inspiration) হঠাৎ তাঁহার মনে উদয় হয় এবং ইহার ফলোপধায়িতা দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়াছেন।

হিন্দুরা দৈবজ্ঞানে অনেক দৈব ঔষধ পান, রমাবাইয়ের প্রতি ঈশ্বরানুগ্রহ আশ্চর্য্য নহে।

বুয়ারদিগের দুর্ভাগ্য—বুয়ারেরা মধ্যস্থতার জন্য হেগের শান্তি সভায় আবেদন করিয়াছিল। সভা এ বিষয় বিচারে আপনাদের অক্ষমতা জানাইয়াছেন। সভ্যজগৎ ইংরাজ-বুয়ার যুদ্ধের মূকসাক্ষী, সকলেরই হস্তপদ বদ্ধ।

দুর্ঘটনা—(১) একটী ঝড়ে ইংলণ্ডের তীরে ৬১ খানি জাহাজ ভগ্ন ও ১৭৬ জন লোক বিনষ্ট হইয়াছে। (২) নিউজিলণ্ডের চিভিয়ট নগর ভূমিকম্পে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে! অধিবাসী যাহারা বাঁচিয়াছে, তাম্বুতে বাস করিতেছে। (৩) বঙ্গদেশে অগ্রহায়ণের ঝড় এবার নূতন। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী অনেক স্থানে ক্ষতি হইয়াছে।

ফরাসী তুরস্ক বিবাদ—তুরস্ক সুলতান ফরাসী বণিক্‌দিগের ক্ষতিপূরণে ইতস্ততঃ করাতে এক ফরাসী রণতরী তুরস্কবন্দরে আসিয়া মিটিলিনী নামক স্থান অধিকার করিয়াছে। ফরাসীরা বাণিজ্যদ্রব্যের মাশুল সকল আদায় করিয়া লইতেছেন। একটী যুদ্ধবিভ্রাটের আশঙ্কা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)।

ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদ।

[সঙ্কীর্ত্তনানন্দে]

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল আবার গান গাহিলেন, সঙ্গে খোল করতালি বাজিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন,

নৃত্য করিতে করিতে কতবার সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন; স্পন্দহীন দেহ, স্থির নেত্র, সহাস্য বদন, কোন প্রিয় ভক্তের স্কন্ধদেশে হাত দিয়া আছেন। আবার ভাবান্তে মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য। বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া গানের আকর দিতে লাগিলেন :—

"নাচ মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে;

আপনি নেচে, নাচাও গো মা;

(আবার বলি)হৃদিপদ্মে একবার নাচ মা;

নাচগো ব্রহ্মময়ী;

সেই ভুবন-মোহনরূপে (একবার নাচ মা)।

সে অপূর্ব্ব দৃশ্য! মাতৃগতপ্রাণ, প্রেমে মাতোয়ারা সেই স্বর্গীয় বালকের নৃত্য! ব্রহ্মভক্তেরা তাঁকে বেষ্টন করিয়া করিয়া নৃত্য করিতেছেন, যেন লোহাকে চুম্বক ধরিয়াছে। সকলে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মনাম করিতেছেন, আবার ব্রহ্মের সেই মধুর নাম, মা-নাম করিতেছেন। অনেকে বালকের মত মা মা বলিতে বলিতে কাঁদিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এখনও সমাজের সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হয় নাই। হঠাৎ সেই কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত নিয়ম কোথা ভাসিয়া গিয়াছে! বিজয়কৃষ্ণ রাত্রে বেদীতে বসিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে। সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও আসীন, সম্মুখে বিজয়, বিজয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও অন্যান্য ভক্ত নারীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবেন ও তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবেন, বলিয়া সম্বাদ পাঠাইলে, তিনি একটী ঘরের ভিতর গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিলেন।

* * * *

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বিজয়কে বলিলেন, দেখ, তোমার শাশুড়ীর এক ভক্তি! তা বলে, 'সংসারের কথা আর বলবেন না, এক ঢেউ যাচ্চে, আর কি ঢেউ আসছে!' আমি বল্লুম 'ওগো তোমার আর তাতে কি! তোমার ত জ্ঞান হয়েছে!' তোমার শাশুড়ী তাতে বল্লে আমার আবার কি জ্ঞান হয়েছে, এখনও বিদ্যামায়া অবিদ্যা মায়ার পার হই নাই, শুধু অবিদ্যার পার হলে ত হবে না, আবার বিদ্যার পার হতে হবে, তবে তো জ্ঞান! আপনিই তো ও কথা বলেন।'

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় শ্রীযুক্ত বেণীপাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেণীপাল। (বিজয়ের প্রতি) মহাশয়! তবে গাত্রোত্থান করুন, অনেক দেরি হয়ে গেছে, উপাসনা আরম্ভ করুন্।

বিজয়। মহাশয়, আর উপাসনার কি দরকার! আপনাদের এখানে আগে পায়েসের ব্যবস্থা, তারপর কড়ার ডাল ও অন্যান্য তরকারীর ব্যবস্থা! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিয়া) যে যেমন ভক্ত, সে সেইরূপ আয়োজন করে। সত্বগুণী ভক্ত পায়েস দেয়, রজোগুণী ভক্ত পঞ্চাশ

ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেয়; তমোগুণী ভক্ত ছাগ ও অন্যান্য বলি দেয়।

বিজয় উপাসনা করিতে বেদির উপর বসিবেন কিনা ভাবিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিজয়। (ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি) আপনি অনুমতি করুন, তারপর আমি বেদি থেকে বলবো।

(বিজয়ের প্রতি উপদেশ।)

(ব্রাহ্মসমাজ ও lecture,আচার্য্যের কার্য্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। অভিমান গেলেই হলো। 'আমি লেক্‌চার দিচ্চি', তোমার মনে ও অভিমান না থাকলেই হলো। অহঙ্কার জ্ঞানে হয় না, অজ্ঞানে হয়। যে নিরহঙ্কার, তাহারই জ্ঞান হয়, নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়; উচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায়।

"যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না, আর মুক্তিও হয় না। তাই—সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়। বাছুর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) করে, তাই অত যন্ত্রণা! কষায়ে কাটে, চামড়ায় জুতা হয়; আবার ঢোল ঢাকের চামড়া হয়; সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নাই! শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুনুরীর যন্ত্র তৈয়ার হয়, আর ধুনুরির তাঁতে 'তুঁহু' 'তুঁহু' (তুমি, তুমি) বলতে থাকে, তখন নিস্তার হয়। এখন আর 'হাম্বা' 'হাম্বা' (আমি, আমি) বলছে না, বলছে, 'তুঁহু' 'তুঁহু' (তুমি তুমি) অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা; তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র; তুমিই সব।

(গুরুবাদ)

"গুরু, বাবা ও কর্ত্তা, এই তিন কথায় আমার গায়ে যেন কাঁটা বেঁধে। আমি মার ছেলে, আমি চিরকাল বালক, আমি আবার বাবা কি? ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। 'যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, 'দূর—দূর, গুরু কিরে? এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোনও উপায় নাই। তিনিই একমাত্র এই ভবসাগরের কাণ্ডারী।'

(বিজয়ের প্রতি) আচার্য্যগিরি করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয়। অমনি দশজন মানচে দেখে পায়ের উপর পা দিয়ে বোসে, 'আমি বলছি আর তোমরা শুন।' এই ভাবটা বড় খারাপ, তার ঐ পর্য্যন্ত! ঐ একটু মান্য, লোকে হদ্দ বলবে, 'আহা, বিজয় বাবু বেশ বল্লেন, লোকটা খুব জ্ঞানী।' আমি বলছি, এ জ্ঞান ক'রনা। আমি মাকে বলি, "মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও, তেমনি বলি।"

বিজয়। (বিনীতভাবে) আপনি বলুন, তবে আমি বেদির উপর গিয়া ব'সব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) আমি কি বোলব; চাঁদামামা সকলেরই মামা। যদি আন্তরিক হয়, তা হ'লে কোন ভয় নাই।

বিজয় আবার অনুনয় করাতে শ্রীরাম-

কৃষ্ণ বলিলেন, "যাও, যেমন পদ্ধতি আছে, তেমনি করোগে। আন্তরিক ভাব তাঁর উপর থাকলেই হলো।"

* * * *

তদনন্তর বিজয় বেদিতে আসীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিলেন। বিজয় প্রার্থনার সময় মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, সকলেরই মন দ্রবীভূত হইল।

উপাসনান্তে ভক্তদের সেবার জন্য ভোজনের আয়োজন হইতে লাগিল। সতরঞ্চ, গালিচা সমস্ত উঠাইয়া পাতা হইতে লাগিল, ভক্তেরা সকলেই বসিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণেরও আসন হইল। তিনিও বসিয়া শ্রীযুক্ত বেণী পাল প্রদত্ত উপাদেয় লুচি, কচুরী, পাঁপর, নানাবিধ মিষ্টান্ন, দধি, ক্ষীর ইত্যাদি সমস্ত ভগবানকে নিবেদন করিয়া আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

* * *

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে সকলে পান খাইতে খাইতে বাটী প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিজয়ের সহিত একান্তে বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। সেখানে মাষ্টার ছিলেন।

(ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) তুমি তাঁকে মা মা বলে প্রার্থনা কর্‌ছিলে, এ খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ের টান বাপের চেয়ে বেশী।

"মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর জোর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমিদারী থেকে গাড়ী গাড়ী ধন আসছিল, সঙ্গে কত লাল পাক্‌ড়িওয়ালা লাঠি হাতে দ্বারবান্। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে জোর করে সব ধন কেড়ে নিলে, মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তেমন নালিস চলে না।

বিজয়। ব্রহ্ম সাকার না নিরাকার মা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী (আদ্যা শক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে, দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা তাই। কালী কিনা—যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন। কালী 'সাকার, নিরাকার।' তোমার যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস হয়, তুমি কালীকে সেইরূপে চিন্তা করবে। একটা দৃঢ় করে তাঁর চিন্তা করলে তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যাম-পুকুরে পৌঁছিলে তেলীপাড়াও জানতে পারবে, তখন জানতে পারবে যে, 'তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা বল্‌চি। বিশ্বাস করো, সব হয়ে যাবে। আর একটী কথা; —তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস হয়, তাই বিশ্বাস দৃঢ় করে করো। কিন্তু

মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বলো, আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আরো কত কি হতে পারেন, তিনি জানেন, আমি জানি না; বুঝতে পারি না। মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা করে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তাহলে বুঝা যায়; নচেৎ নয়।

(কালী ব্রহ্ম কথন্ অভেদ)।

"যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। অভেদ।

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব
করি যাঁরে,
সেটা চাতরে কি
ভাঙ্গবো হাঁড়ি বোঝ্ নারে মন ঠারে
ঠোরে॥"

'আমি তত্ত্ব করি যাঁরে অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মকে তত্ত্ব করছি। তাঁরেই মা মা বলে ডাকছি। আবার রামপ্রসাদ ঐ কথাই বল্‌ছে,

"আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

অধর্ম্ম কি না অবৈধ কর্ম্ম। ধর্ম্ম কি না বৈধী ধর্ম্ম—এতো দান করতে হবে, এতো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম্ম।"

বিজয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ করলে কি বাকী থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুদ্ধা ভক্তি। আমি মাকে বলেছিলাম 'মা, এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। দেখ আমি জ্ঞান পর্য্যন্ত চাই নাই। আমি লোকমান্যও চাই নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়লে শুদ্ধা ভক্তি—অমলা, নিষ্কাম, অহেতুকী ভক্তি বাকি থাকে।

(ব্রাহ্মসমাজ ও আদ্যাশক্তি)।

একজন ব্রাহ্মভক্ত। তিনি আর তাঁর শক্তি কি তফাৎ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ: যেমন মণির জ্যোতি আর মণি অভেদ। মণির জ্যোতি ভাবলেই মণি ভাবতে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব যেমন অভেদ। একটাকে ভাবলেই আর একটাকে ভাবতে হয়। কিন্তু এ অভেদ জ্ঞান, পূর্ণজ্ঞান না হলে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চলে যেতে হয়—অহংতত্ত্বও থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না। নেমে এসে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধিভঙ্গের পর 'ওঁ ওঁ' বলি, তখন বলি, তখন আমি একশো হাত নেবে এসেছি। ব্রহ্ম বেদ বিধির সার, মুখে বলা যায় না। সেখানে 'আমি' 'তুমি' নাই।

"যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, ততক্ষণ

আমি প্রার্থনা কি ধ্যান করছি, এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ 'তুমি' (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুনচ, এ জ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ, তুমি মা, আমি ছেলে, এ বোধ থাকবে। এই ভেদ-বোধ, আমি একটী, তুমি একটী, এ ভেদ-বোধ তিনিই করাচ্চেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার এই সব ভেদ বোধ হচ্চে। যতক্ষণ এই ভেদ-বোধ, ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মনেতে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন, হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না। আর তিনি তখন ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন।

"তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে, যতক্ষণ ভেদ-বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আদ্যা শক্তি বলে গেছে।

বনবাসিনীর পত্র।

বনযাত্রার বিবরণ।

জ্যোতিপুর হইতে লাঠাবনে যাত্রা। এখান হইতে যাত্রা করিতে পথিমধ্যে বয়জ নামে গ্রাম, বলদেব কুণ্ড এবং দাউজী দর্শন আছে। ব্রজবাসিগণ বলেন লাঠাবনে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত লাঠি খেলা করিতেন। এখানে বন বা বনের কোন দৃশ্য নাই। এখানে ভরতপুরের রাজার বাটী এবং গড়বন্দী সেনানিবাস ও একটী সৌধাদৃশ্যময় বৃহৎ কুণ্ড ও নানাবিধ ফুলের বাগান আছে। এই বাগান ব্যাপিয়া অসংখ্য ফোয়ারা আছে। রাজার যাত্রায় প্রায় সকল স্থানেই একদিন বাস; বেলা ৪টা বাজিলে ঐ সকল ফোয়ারা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তখন এই অসংখ্য ফোয়ারা হইতে একেবারে জল বর্ষণ হইতে থাকে এবং ড্রেণসমূহ ও বৃহৎ বৃহৎ চৌবাচ্চা সকল জলপূর্ণ হইয়া নদী নালা পুষ্করিণীর আকার ধারণ করিয়া জনগণের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করে। রাজার বনযাত্রায় যত যাত্রী আসে, রাজা সকলকেই যাহার যাহা অভিমত—ময়দা ঘৃত লবণ দাল প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য দ্বারা ভোজন করাইয়া থাকেন। তবে যে যাত্রী পুণ্য সঞ্চয় করিতে যান, তিনি কোন দান গ্রহণ করেন না। রাজার যাত্রী এখান হইতেই কাম্যবন যাত্রা করেন, কিন্তু গোঁসাই যাত্রী এখান হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে সুদামা কুণ্ড, সুদাম ঠাকুর, তৎপরে অলক-গঙ্গা এবং আধবদরী নারায়ণ দর্শন করিয়া পরমাদার নামক একটী স্থানে একরাত্রি বাস করিয়া কাম্যবন যাত্রা করেন। কাম্যবন দর্শন করিয়া পৌরাণিক কত কথা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। যুধিষ্ঠিরাদি

পঞ্চভ্রাতায় এই বনেই বাস করিয়াছিলেন। আজ আমরা পুরাণোক্ত সেই পরম পবিত্র কাম্যবনে উপস্থিত, ইহা ভাবিতে ভাবিতে হর্ষ বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! না জানি সে সময়ে এই বনের আরো কতই শোভা ছিল! এখন যে এত গ্রাম নগর হাট বাজার দালান কোটা কেল্লা মঞ্চ দেবালয় প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া এই মহা-বনটী মহানগরীর আকার ধারণ করিয়াছে, তবুও সুদৃঢ় প্রাচীরবন্ধের ন্যায় চতুর্দ্দিকে গিরিমালা মণ্ডিত এই বনটীর নির্জ্জনতা বা মনোহারিত্ব কিছুতেই নষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই।

এই বনমধ্যে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অনেক লীলা করিয়াছিলেন। ব্রজবাসীরা যাত্রী-দিগকে সেই সকল স্থান দর্শন করাইয়া থাকেন। এখানে বিমলাকুণ্ড, শীতলা-কুণ্ড, গয়াকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে বিমলাকুণ্ডই প্রধান এবং সুপ্রশস্ত! এই কুণ্ডের ধারে যাত্রা স্থাপিত হয়। এখানে ৺গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদন-মোহন প্রভৃতি মনোহর মনোহর বিগ্রহের প্রতিমা এবং চৌরাশী খাম্বা দর্শন আছে। চৌরাশী খাম্বা অর্থাৎ ৮৪টী বৃহৎ বৃহৎ থামযুক্ত বহুকালের একটী প্রাচীন দালান অথবা নাটমন্দির আছে। ইহা যে কোন্ সময়ের, ব্রজবাসিগণ তাহা ঠিক্ বলিতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন এই স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই বনটীও পরিক্রমা করে। পরিক্রমাতে পাঁচ ক্রোশ পড়ে। প্রথমে বিমলাকুণ্ডের ধার হইতে আরম্ভ করিয়া খানিক গিয়া যশোদাকুণ্ড, মধুসূদনকুণ্ড, যশোদা দর্শন; তৎপরে সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামক জলপূর্ণ একটি পাথারের ন্যায় স্থান। ব্রজবাসিগণ বলেন, ব্রজ-গোপীগণ সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শন করিতে চাহিলে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানে বানরের দ্বারা পাথর বহন করাইয়া. তাঁহাদের মনোভিলাষ পূর্ণ করেন। এখানে রামেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং হনুমানজী দর্শন ও লঙ্কাকুণ্ড নামক একটী ইন্দারা আছে। তৎপরে খানিক গিয়া লুকলুকানি নামক একটী কুণ্ড এবং চরণ পাহাড়ী আছে। কথিত আছে কৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণের সঙ্গে জলমধ্যে লুকাচুরী খেলিতে খেলিতে অদৃশ্য ভাবে পলাইয়া নিকটস্থ পাহাড়ের উপর গিয়া লুকাইয়াছিলেন। এ দিকে গোপীগণ জলমধ্যে বহু অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া যখন নিতান্ত অস্থির এবং কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন কৃষ্ণচন্দ্র পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া বংশী-ধ্বনি করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উক্ত বংশীধ্বনিতে পাহাড় দ্রব হইয়াছিল, তাহাতে কর্দ্দমে অঙ্কিত চিহ্নের ন্যায় সেই পাহাড়ে চরণ-চিহ্ন আছে। তৎপরে ঘিসলিনী নামক একটি খেলার পাহাড়। ব্রজবাসিগণ যাত্রীদিগকে বলেন এখানে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র খেলা করিয়াছিলেন, তোমরাও খেলা কর। অনেক যাত্রী এই মতে খেলা করিতে উপরে যাইয়া বসে। পরে ৭৮ হাত উচ্চ স্থান হইতে

সর্ সর্ করিয়া নামিয়া পড়ে, তাহাতে আনন্দ ভিন্ন কোন কষ্ট হয় না। সমুদয় পাহাড়ের মধ্যে একটি সরু পথের ন্যায় প্রকৃতি-নির্ম্মিত এই বসিবার যোগ্য স্থানটুকু অতিশয় মসৃণ ও সুদৃশ্য। তৎপরে খানিক গিয়া আলতা-পাহাড়ী নামে একটি পাহাড়। ব্রজবাসী বলেন এখানে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতী রাধিকাজীকে আলতা পরাইয়াছিলেন। পরে আর খানিক গিয়া একটি পাহাড়ে ভোমাসুরের গোফা আছে। যাত্রীগণ পরিক্রমণ করিতে করিতে যায় পর নাই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে সকলে এ পাহাড়ে না উঠিয়া অনতিদূরে ভোজনথালী নামক স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করে। আমরা গোফা দেখিতে পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। এ পাহাড়ে উঠিবার সোপান নাই, লতা পাতা স্খলিত প্রস্তরাদি অবলম্বন করিয়া অনেক কষ্টে উঠা নামা করিতে হয়। আমরা অনেক কষ্টে উপরে উঠিলাম, উপরে উঠিয়া মনে বেশ আনন্দ পাইলাম। স্থানে স্থানে পরিষ্কার ধবধবে প্রস্তরসমূহ, যেন কেহ বসিবার আসন বিছাইয়া রাখিয়াছে, মধ্যে মধ্যে নিম্ন স্থানসমূহে বৃষ্টির জল বদ্ধ হইয়া পরিষ্কার জলপূর্ণ পাত্রের ন্যায় শোভমান হইতেছে, বিবিধ বনলতাবলী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্যতরুকে অবলম্বন করিয়া হেলিয়া দুলিয়া যেন নৃত্য করিতেছে, নানাবিধ পক্ষিগণ কলরব করিতেছে, ইত্যাদি বিবিধ মনোহর মনোহর দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে আমরা আপনা ভুলিয়া কতক্ষণ সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরেই বসিয়া রহিলাম। এইমাত্র সহস্রাধিক যাত্রীর কোলাহলে চলিতে চলিতে এই নির্জ্জন স্থান আমাদের বেশ শান্তিপ্রদ হইল। পরে গোফার কথা স্মরণ হইল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া গোফার দর্শন পাইলাম। বাস্তবিক গোফাটী অসুরের বাসযোগ্যই বটে; ইহা মানবের বাসযোগ্য নহে। কেমন বিসদৃশ ভাবে গোফাটী নির্ম্মিত, ইহাতে না যায় দাঁড়ান, না যায় বসা, কেবল অন্ধকারময়। যাহা হউক তবুও দেখার সাধ; শুইয়া শুইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। শেষে যখন মাথায় পিঠে পাথরের ঘা লাগিতে লাগিল, তখন দেখার সাধ মিটাইয়া বাহিরে আসিতে বাধ্য হইলাম। পরে গোফার বাহিরের দ্বারদেশে পাহাড়ের গাত্রসংলগ্ন একটী বন্য বৃক্ষের মূলে অনেক কষ্ট করিয়া দুইজনে উপবেশন করিলাম এবং সঙ্গিনী আমার কাতরপ্রাণে গান গাহিতে লাগিলেন—

আর কত দিন ভবঘোরে ঘুরাবে হে
দয়াময়!
প্রাণান্ত হলেও বুঝি দেখা দিবে না
আমায়॥
(আমরা) মরি সদাই ঘুরে ঘুরে, কত
নগর প্রান্তরে, কখনও গিরিগহ্বরে
দেখিব বলে তোমায়।
তোমাকে পাবার আশে, এসেছি এ
বনবাসে সদা চাহি আসে পাশে তোমাকে
দেখার আশায়॥

চাঁদের কিরণ মাঝারে, কিবা অমানিশা ঘোরে, চমকি চাহিয়া ফিরে দেখি মরী-
চিকাময়॥

কাঙ্গালের ধন তুমি, তাই হে জগত-
চিন্তামণি দীনা বসন্ত-কামিনী চায় তব
চরণাশ্রয়॥

সঙ্গিনী সুস্বরে গান করিতেছেন, আমিও স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছি, হঠাৎ চাহিয়া দেখিলাম আমাদের সম্মুখ হইতে একটি ছায়া অপসারিত হইয়া গেল। আমরা চারিদিক্ অন্বেষণ করিতে করিতে ঝোপের মধ্য দিয়া একখানি মুখ দেখিতে পাইলাম। তখন আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং ঝোপের মধ্য হইতে আন্দাজ ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রমের একটী বালক আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কহিল, "বাই! তোম লোক সারাদিন হিঁয়াই বৈঠে রহেগা? ধুপতো বহুৎ নিকরাইয়ে; আউর যাত্রা ত থোড়া দেরসে হিঁয়াথে উঠেগা।" বালকের এই কথা শুনিয়া আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পাহাড় হইতে নামিবার পথ খুঁজিতে লাগিলাম; কিন্তু সহজ পথ না পাইয়া বড়ই কষ্টে পড়িলাম। তখন আবার সেই বালক আসিয়া আমাদিগকে এমন একটী সহজ পথ দেখাইয়া দিল যে আমরা বিনা ক্লেশে নামিতে পারিলাম এবং সেই পথ উঠিবার পক্ষেও খুব সহজ ইহা বুঝিলাম। এই সময় আমরা বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ! আপ কাঁহা বিরাজ?" বালক কহিল, "হামতো গোউ ভঁইষ চরাণ কো রাখাল হোই, সারাদিন বনমে বনমে পাহাড়মে ডুলিয়া ফিরি।" ইহা বলিতে বলিতে উপরে চলিয়া গেল। আমরাও রাখালের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভোজনথালীতে আসিয়া মহা ধুমধামে ভোজনের ব্যাপার দেখিলাম। সে দিন মাধুকরীতে যাচিয়া যাচিয়া অনেকে নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাইল। পরে তথা হইতে পুনরায় বিমলাকুণ্ডের ধারে যাত্রা চলিল।

(ক্রমশঃ)।

কাশীধাম—ভাদ্রমাস।

পাঁচপুকুরের তীর্থযাত্রা।

"বার মাসে তের পার্ব্বণ" একটী প্রসিদ্ধ প্রবচন। কিন্তু পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে প্রায় প্রত্যহ নূতন নূতন পার্ব্বণ। আমি আজি প্রায় তিন বৎসর এখানে বাস করিতেছি, এমন দিন অল্পই দেখিয়াছি যে দিন কোন না কোন পার্ব্বণ নাই। স্নানদান, পূজার্চ্চনা প্রভৃতি পুণ্যানুষ্ঠান সকল নিত্যকর্ম্ম। প্রত্যূষ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যাত্রিগণ গঙ্গা-স্নানে ধৌত-দেহ হইয়া বিচিত্র কৌশেয় পরিধানপূর্ব্বক জল ও পুষ্পপাত্র হস্তে দলে দলে, মন্দিরে মন্দিরে

অবিশ্রান্ত যাত্রা (দেব-দর্শন) করিয়া বেড়াইতেছে। পথ ঘাট দেবালয় সর্ব্বস্থানই তীর্থযাত্রী, পাণ্ডা ও দণ্ডী সমাগমে পরিপূর্ণ। "হর হর বোম্ বোম্, গৌরী-শঙ্কর, সীতারাম, শিব শিব শম্ভো" প্রভৃতি শক্তিপূর্ণ স্তুতিগানে দিঙ্‌মণ্ডল নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাংস্য ও নহবত বাদ্য শব্দে কাশীধাম নিয়ত নিনাদিত। বাস্তবিক ভূমণ্ডলে এমন পরম পবিত্র তীর্থ নগর দুর্লভ। ইহা ত গেল নিত্যানুষ্ঠান ব্যাপার। পর্ব্বদিনের বিশেষত্ব ইহার বহুগুণ অধিক। যাত্রীর ভিড়, দর্শকের কোলাহল এবং মেলার সমারোহে দিগন্ত প্রকম্পিত। আমরা সময়ে সময়ে প্রধান প্রধান পার্ব্বণ সকলের বিবরণ প্রকটিত করিয়া পাঠিকাগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিব।

ভাদ্রমাসে অনেকগুলি পার্ব্বণ আছে, তন্মধ্যে পাঁচপুকুরের যাত্রা একটী প্রধান। ভাদ্রকৌশী অমাবস্যার যোগে এই তীর্থ যাত্রা। "পাঁচপুকুর" অর্থাৎ পাঁচটী পুষ্করিণীতে স্নান ও পূজা। আমরা পৌরাণিক আখ্যায়িকা পরিহার করিয়া কেবল স্থূল তীর্থ স্থান বর্ণনা করিব। পৌরাণিক ব্যাখ্যা, কাশীখণ্ড ও অন্যান্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। পাঁচটী পুষ্করিণী যথা—ঋণমোচন, পাপমোচন, কপালমোচন, বৈতরণী ও বৈতরণী।

১ম ঋণমোচন তীর্থ—বিশ্বেশ্বর গঞ্জের কিছু দূরে হনুমান ফটকের নিকট একটী পুষ্করিণী বা জলাশয় আছে। ইহা উন্নত পাহাড়, নিবিড় জঙ্গল, গুল্ম ও তৃণে আবৃত। এই পুষ্করিণীটীই ঋণমোচন তীর্থ। যাত্রিগণ সংকল্প করিয়া পাণ্ডার মুখে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিয়া ঋণমুক্ত হইয়া থাকে। জল যেরূপ কদর্য্য, তাহাতে একবারে দেহমুক্ত হওয়াই সম্ভব। ইহারই অনতিদূরে (২য়) পাপমোচন তীর্থ। ইহারও চতুর্দ্দিকে বন ও জঙ্গল; পার্শ্বে অনাবৃত স্থানে একটী শিবলিঙ্গ। তীর্থে স্নান করিয়া ইহার পূজা দ্বারা স্নাতক পাপমুক্ত হয়।

কিয়দ্দূর পরেই (৩য়) কপালমোচন তীর্থ। কুণ্ডটী গজগিরি করা ও প্রশস্ত ঘাটবিশিষ্ট। জল শৈবালযুক্ত হইলেও পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীদ্বয় অপেক্ষা অনেক অংশে উত্তম। এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় সংকল্প করিয়া স্নানদান সমাপনপূর্ব্বক কূলস্থ লাট ভৈরবের পূজা করিতে হয়। কাশীতে আটটী ভৈরব মূর্ত্তি আছে—ইহা তাহারই একটী। ইহার মন্দির নাই। একটী সুপ্রশস্ত ও সমুচ্চ পাষাণময় অঙ্গনের এক দেশে স্থাপিত। স্থানটী অতি পবিত্র এবং মধ্যযুগে শ্রেষ্ঠ তীর্থ মধ্যে পরিগণিত ছিল, তাই হিন্দু-দেব-দ্বেষী মুসলমান সম্রাট্ অরেংজীব তাহা ভূমিসাৎ করিয়া সেই স্থানে একটী প্রশস্ত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছে। অঙ্গনটী মসজিদের অংশ এবং স্থানে স্থানে কবর-রচিত। যে সময়ে বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া জুম্মা মসজিদ, বেণীমাধবের মন্দির ভাঙ্গিয়া প্রকাণ্ড চূড়া-

বিশিষ্ট পঞ্চগঙ্গার ঘাটের উপর প্রশস্ত মসজিদ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল, লাট ভৈরবের মন্দিরও সেই সময় বিধ্বস্ত হয়। মুসলমান ক্ষমতা খর্ব্ব হইলে বোধ হয় ইহার উদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। তাই এই অনাবৃত অঙ্গনের বা কবর স্থানের একপার্শ্বে কয়েক হস্ত পরিমিত স্থান অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে লাটভৈরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৪।৫ পাদ উচ্চ একটী ভগ্ন স্তম্ভের গাত্রে রৌপ্যময় মস্তক স্থাপিত—ইহাই লাটভৈরব-মূর্ত্তি। দক্ষিণ পার্শ্বে ইহার প্রিয় পূজারীর প্রতি-মূর্ত্তি এবং বামপার্শ্বে কুকুর-মূর্ত্তিধারী। "বিষম ভৈরব।" চৌদিকে অন্যান্য দেব-গণের উদ্দেশে শিলাখণ্ড সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সমস্তই আধুনিক ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। লাটভৈরব কাশীর একটী দর্শনীয় পদার্থ। হণ্টার সাহেব অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিয়া-ছেন যে, ভগ্নস্তম্ভাংশ বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের স্তম্ভের কিয়দংশ। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও একটী স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পরাজয় ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান সময়ে অশোক-স্তম্ভ ভগ্ন করিয়া লাট ভৈরব রূপে পরিণত করা হইয়াছে। এখানে ও নগরের অনেকাংশে বৌদ্ধ চৈত্যাদির প্রভূত ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়। এক্ষণে মুসলমানেরাই লাট ভৈরবের প্রকৃত অধিকারী। কপাল-মোচন ঘাটের উপর উঠিয়াই দক্ষিণে অঙ্গনের উপর একটী কবর ও বামে সমস্ত পশ্চিম সীমা বিস্তৃত প্রকাণ্ড মসজিদ। এখানে প্রতিদিন পাঁচবার "নমাজ" হইয়া থাকে। উত্তরে নামিবার সোপান পার্শ্বেও কবর এবং পূর্ব্বে লাট ভৈরবের প্রাচীর সংযুক্ত কবর ও মসজিদ। অঙ্গনের অব্যবহিত নিম্নেও অনেক কবর; লাট ভৈরব যেন শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছেন। উত্তরে নামিবার ১৫টী উচ্চ সোপান।

ইহার কিয়দ্দূরে রেলপথ অতিক্রম করিয়াই (৪) ঐতরণী তীর্থ। ইহা একটি কদর্য্য স্বল্পতোয় জলাশয়, বর্ষাভিন্ন অন্য সময়ে জল থাকে না। স্থানটীর কিছুই বিশেষত্ব নাই, তবে চৌদিকে প্রহরীর ন্যায় কতিপয় তালবৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে মাত্র। ইহারই একটী আঘাটায় পাণ্ডা ঠাকুর বৃহৎপত্রের আতপত্র প্রোথিত করিয়া তন্নিম্নে সমবেত যাত্রীদিগকে মন্ত্র পাঠ করাইয়া স্নানার্চ্চন কার্য্য সম্পন্ন করাইতেছেন এবং কদর্য্য পঙ্কিল পল্বলে গঙ্গা, সরস্বতী, ধৌতপাপ প্রভৃতি পঞ্চ-গঙ্গার আবির্ভাব কল্পনা করিয়া তাহা-দিগের ভক্তিভাব উদ্রিক্ত করিতেছেন। আমরা কুরুক্ষেত্রেও এইরূপ পবিত্র পল্বল সকল দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদিগের ঘাট বাঁধান ও চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান পরিষ্কার থাকাতে অসুন্দর দেখায় না।

ইহার কিয়দ্দূরে (৫) বৈতরণী তীর্থ। পুষ্করিণীটী স্বল্পগাধ, কিন্তু ইহার একটী পরিষ্কার বাঁধাঘাট আছে, যাত্রিগণ পূর্ব্বমত সংস্কার ও মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক স্নান করিয়া

পারের সম্বল করিয়া থাকে। আমরা দেখিলাম কেহ কেহ সন্তরণ দ্বারা পুষ্করিণীটী পার হইয়া সশরীরে প্রেতনদী পারের পুণ্যলাভ করিতে লাগিল ঘাটের উপরে একটী সামান্য উদ্যানে বৈতরণীশ্বর শিবমন্দির। মন্দিরটী ক্ষুদ্র ও আধুনিক। যাত্রিগণ বৈতরণীশ্বরের পূজা করিয়া পাঁচপুকুর তীর্থযাত্রা সমাপনানন্তর স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। এই যাত্রোপলক্ষে স্থানে স্থানে বিশেষতঃ হনুমান ফটকে মেলা বসিয়া থাকে।

কাশীতে ৬৪ যোগিনী, ৫৬ গণেশ, ৯ চণ্ডী, ১২ আদিত্য, ১৬ গৌরী, ৭ ঋষি, ৭ পুরী, ৮ ভৈরব, ১৪ মহালিঙ্গ ও অসংখ্য শিব ও দেবদেবী আছেন। সম্বৎসরে ইহাদিগের প্রায় প্রত্যেকের পূজার্থ পার্ব্বণদিন নির্দ্দিষ্ট আছে। এতদুপলক্ষে বিশেষ সমারোহ ও মেলা হইয়া থাকে।

সহিষ্ণুতা।

সহিষ্ণুতা মানব হৃদয়ের একটি অমূল্য অপার্থিব রত্ন। ইহার গুণ বর্ণনাতীত। ইহার অত্যাশ্চর্য্য শক্তি যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই অনুভব করিতে পারিয়াছেন। যদিও অনেক সময় আমরা ইহার কার্য্য দেখি, তথাপি সব সময় হয়ত ইহার প্রকৃত গুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এ স্বর্গের শক্তি যে হৃদয়ে নাই, সে হৃদয় অসংযত। যাঁহার হৃদয়ে যত অধিক পরিমাণে এই সুন্দর বৃত্তিটি ক্রীড়া করে, তাঁহার হৃদয় ক্রমে তত অধিকতর উদার হইয়া শান্ত, সংযত, পবিত্র ও নিয়মিত হয়।

এই দুস্তর জীবন পথে চলিতে চলিতে কত সময় আমাদের কত অসন্তোষ, দুঃখ ও বিরক্তির কারণ ঘটিয়া থাকে। আমরা যদি তাহার প্রত্যেকটাকে গায়ে মাখিয়া লই, তবে আমাদের শান্তি কোথায়, সুখ কোথায়? অসহিষ্ণু ব্যক্তি তাহার নিজের জীবনের শান্তিত নষ্ট করেই, আবার অপরের জীবনেরও শান্তি কতক পরিমাণে নষ্ট করিয়া থাকে।

সহিষ্ণুতা পারিবারিক জীবনেরও মহা রত্ন। যাহাদের সহিত একত্র সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাঁহারা সকলেই নির্দ্দোষ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সরল ও পবিত্র-প্রকৃতি হইবেন এরূপ আশা করা বৃথা। তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক ত্রুটির জন্য যদি সর্ব্বদা খিট খিট করিতে হয়, তাহা হইলে জীবনের শান্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়। তাঁহাদের দোষগুলি দূর করিবার জন্য আমরা কোমলভাবে যথোচিত যত্ন করিব, তথাপি তাহা যদি না যায়, তবে পারিবারিক শান্তির জন্য আমাদের তাহা সহ্য করিয়া লইতে হইবে। যিনি তাহা করিতে না পারিবেন, তাঁহার সংসারে

প্রবেশ না করাই ভাল! অসংখ্য অসুবিধা অসন্তোষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে জীবন পথে অগ্রসর হইতে হয়, একমাত্র সহিষ্ণুতাই আমাদের সেই পথকে সরল ও প্রশস্ত করিয়া দেয়। কত সময় আমাদের ভাগ্যে অবিবেচিকা মাতা, কলহপরায়ণা পত্নী ও অসহিষ্ণু উগ্র প্রকৃতির ভ্রাতা ভগ্নী ও উদ্ধতস্বভাব পুত্র কন্যা ঘটিয়া থাকে। সেই বিরুদ্ধ প্রকৃতির লোকদিগকে লইয়া সংসার করিতে হইলে কত যন্ত্রণার কারণ হইয়া থাকে। সেই সময় যদি আমাদের প্রাণে সহিষ্ণুতা-রূপিণী দেবী না থাকেন, তবে সংসার কি ভূত প্রেত দৈত্য দানবের ক্রীড়া-কানন হইয়া উঠে না? আবার যখন আমরা পরের দাসত্বে নিযুক্ত হই, তখন ত কথাই নাই। প্রায়শঃই উচ্চ কর্ম্মচারীদের ভ্রূকুটিভঙ্গিতে নিমেষে নিমেষে প্রাণে তিক্ত রস ঢালিয়া দেয়, হৃদয় অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে। তখন যদি আমরা সেই মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের ও আমাদের প্রাণ-প্রিয় পুত্র কলত্র প্রভৃতির কি দুর্দ্দশা হইয়া থাকে? যদি পরের দাসত্ব না করিয়া স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করি, তাহা হইলেও নানা প্রকৃতি ও চরিত্রের লোক লইয়া আমাদের কারবার করিতে হয়, পদে পদে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কারণ শ্রমজীবী শ্রেণীর নিকট আমরা সর্ব্বদা ন্যায়পরতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতার আশা করিতে পারি না, বরং তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করিলে তাহারা অনেক সময়েই কার্য্যে শৈথিল্য করিয়া থাকে। এইত গেল পুরুষদের কথা। নারী-জীবনে সহিষ্ণুতার আরো অনেক গুণ অধিক প্রয়োজন। পুরুষ হইলে অনেক সময় বিশেষ কিছু আসে যায় না, কিন্তু চির-পরাধীন নারী-জীবনে যদি সহিষ্ণুতা না থাকে, তবে, প্রতি পদক্ষেপে ঘোর বিড়ম্বনা সহিতে হয়।

যদিও আমাদের সমাজে এখন পূর্ব্বের ন্যায় বধূ-লাঞ্ছনা প্রচলিত নাই, তথাপি সর্ব্বদাই যে কুলবধূরা সুখে থাকে, এরূপ নহে। শ্বশুর শাশুড়ী দেবর ননদ ভাসুর-পত্নী দেবরপত্নীদিগকে লইয়া তাহাদের সংসার করিতে হয়। তাহারা সকলেই যে ভাল লোক বা সকলেই যে বধূদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করেন এমন নয়; পরন্তু অনেক সময় গোপনে নানা প্রকার ক্লেশ দেন। তখন উৎপীড়িত বধূ যদি অত্যাচার সহ্য না করিয়া তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করিতে থাকে, তবে অশান্তি দূর না হইয়া আরো বৃদ্ধি পায়।

ইহা ব্যতীত শাশুড়ী স্বামীর মতভেদের জন্যও বালিকা বধূ অনেক ক্লেশভোগ করে, শাশুড়ী একেবারে সেকেলে না হইলেও বধূ যাহাতে সংসারের কার্য্যে অধিক মনোনিবেশ করে, এই তাঁহার ইচ্ছা। স্বামী উচ্চ শিক্ষিত, নব্য যুবক, কিন্তু পত্নী প্রায়ই অর্দ্ধশিক্ষিতা, সুতরাং তাঁহাদের অনুপযুক্তা হইয়া থাকেন। কাজেই পতি তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য

ব্যগ্র হইয়া তদ্রূপ চেষ্টা করেন। তখন বালিকা উভয় সঙ্কটে পড়িয়া কোন বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইতে পারে না এবং উভয়ের নিকটেই ভৎর্সনা প্রাপ্ত হয়।

ইহা ব্যতীত দাম্পত্য জীবনে সহিষ্ণুতার যত প্রয়োজন, এত আর কিছুতেই নয়। পতি যে পথে চলিতে বলেন, পত্নী হয় ত অনভিজ্ঞতা বা বুদ্ধিহীনতা বশতঃ সেই পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। স্বামী যদি সেই ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া লন, তবেই রক্ষা; নতুবা সংসার ছারখার হইয়া যায়। দোষে গুণে মনুষ্য জীবন। একটু সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে, একটু ত্যাগ স্বীকার করিলে—যদি জীবনের শান্তি বজায় থাকে; তাহাতে যে ব্যক্তি পরাঙ্মুখ হয়, সে সেই সুখতরুর মূলে কুঠারাঘাত করে।

অনেক সময় বেশ্যাসক্ত মদ্যপায়ী স্বামীর পদযুগল অশ্রুসিক্ত করিয়া তাঁহাকে সতত মিষ্টবাক্য বলিয়া ও তাহার সেবা করিয়া সাধ্বী রমণীরা বহুবর্ষের পরে আপনাপন পতিকে বশীভূত করেন। তাঁহাদের অপরাজিত প্রেমে, অসীম সেবা গুণে ও অলৌকিক ধৈর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের পতিগণ সৎপথ অবলম্বন করেন। ইহা কি সেই সংসার-সুধা সহিষ্ণুতার অপূর্ব্ব নিদর্শন নহে? যিনি দাম্পত্য জীবনকে সহিষ্ণুতা দ্বারা ভূষিত না করেন, তিনি আপনার সংসারকে বিষময় করেন এবং তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র কন্যার জীবনকেও বিষাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করেন। ইহার কারণ যে দম্পতীর মধ্যে সুপবিত্র, সুদৃঢ় প্রণয় ও অপরিসীম বিশ্বাস না থাকে, যাঁহারা নিজেদের সদ্গুণের অভাবে সর্ব্বদা অসন্তোষানলে জীবনাহুতি দেন, সেই দম্পতীর সন্তানগণ কখনই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। তাহারা আজীবন পিতা মাতার সেই পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা, তাচ্ছিল্য ও ঈর্ষার ভাব দেখিয়া তাহাই শিখে এবং তাহাদের নিজ বিবেচনা শক্তির দ্বারা বিচার করিয়া পিতা মাতা উভয়কেই মনে মনে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কন্যা হয় ত মাতার ন্যায় নিজ পতিকে অশ্রদ্ধা করে, পুত্র স্বীয় পত্নীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিবার সুবিধা পায়। তাই বলি যে দাম্পত্য জীবনের উপর ভবিষ্যৎ বংশের চরিত্র নির্ভর করে, একটু অসহিষ্ণুতার জন্য আমরা যদি তাহার অপব্যবহার ও এই গুরুতর অনিষ্ট সংঘটন করি, তাহা হইলে আমরা ত মনুষ্যপদবাচ্য নই! ভ্রাতা ভগিনীগণ! এস আমরা প্রত্যেকে সহিষ্ণুতাকে অবলম্বন করিয়া সংসার পথ সুগম করিয়া লই। আমাদের পুত্র কন্যাগণ আমাদের নিকট হইতে এই গুণ শিক্ষা করিয়া নিজ নিজ জীবন সুশোভিত করুক। আমরা কর্ত্তব্য পালন করিয়া ধন্য হইয়া যাই।

ভ্রাতা ভগিনীগণ! সংসারে সকল মানুষের প্রকৃতি কি সমান হয়? যদিই তোমার আমার ভাগ্যে ক্রোধ-প্রবণ অবিবেচক পতি কিংবা অপ্রিয়ভাষিণী

কুটিলা পত্নী লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা কি করিব? মিষ্ট বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত না করিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে কি অবহেলা করিব? কখনই নহে। জীবনের চির-সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে লইয়া যাহাতে শান্তির সহিত জীবনপথে চলিতে পারি—তাহাই আমরা করিব। আমাদের নিজেদের একটু সহিষ্ণুতার অভাবে যেন আমরা সংসারকে বিষময় না করি। এ শুভ সংকল্পে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বিধাতা অবশ্যই আমাদের সহায়তা করিবেন এবং মনের বল রক্ষার শক্তি দিবেন। হে দেবাদিদেব! তোমারি নির্দ্দেশে যেন আমরা জীবন পথে আগুয়ান হই।

শ্রীকুমুদকুমারী রায়।

ভুল।

(৪৪৩ সংখ্যা—২৬২ পৃষ্ঠার পর)।

এই সব কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব কিরূপ হইল তাহা অবর্ণনীয়। আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া, হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হইল।

মিঃ বসু তৎক্ষণাৎ বিস্তৃত বিবরণ টেলিগ্রামে লিখিয়া বিলাতে পাঠাইলেন।

আমি আশার পুলকে আত্ম-বিস্মৃতের মত আপন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। এ কি সুখ! এ কি অসীম আনন্দ-ধারায় হৃদয় স্নাত হইয়া উঠিল। কেহ কি কখনো এরূপ ভাবে সুখী হইয়াছে? কেহ কি হারান দ্রব্য এরূপ ভাবে ফিরিয়া পাইয়াছে? আবার কখন তাঁহাকে দেখিব, তাঁহার চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা চাহিব, তাহাই মনে হইতে লাগিল। কল্পনায় কত সুখের চিত্র অঙ্কিত করিলাম, তাহা কতবার ভাবিলাম, তাহা কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়? মনে হইতে লাগিল, আমি কত ক্ষুদ্র, কত নীচ, আমার হৃদয় কত অবজ্ঞ। তিনি আর আমি!! তাঁহার সেই মহৎ হৃদয়ে আমার কি আর স্থান হইবে? আমি যে তাঁহার চরণ ধূলারও যোগ্য নই। আমায় কি আর তিনি ভালবাসিবেন? নির্দ্দোষীর মনে কি অসহ যাতনা দিয়াছি। তাঁহার সকল কথাগুলি মনে হইয়া আমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। আশার পুলকে কল্পিত নিরাশা মিলাইয়া গেল। একবার দেখা হইলে, একবার তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিলে তিনি কি আমায় ক্ষমা করিবেন না? তিনি কি জানেন না আমি তাঁহাকে কত ভালবাসি।

পরদিন টেলিগ্রামের উত্তর আসিল, তাহা মিঃ বসুর নামেই ছিল এবং তাহাতে লেখা ছিল,—"আমার হৃদয়ের বোঝা

নামিল। যদিও আমি নিজকে নির্দ্দোষী জানিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু অপরের সন্দেহ বহিতে পারিতেছিলাম না; আমি এক বৎসরের ছুটী লইয়াছি, এখন দেশে ফিরিতে পারিব না। আমার সেবার ব্যারিষ্টারী একজামিন দেওয়া হয় নাই, কি পর্য্যন্ত জমা আছে। একেবারে একজামিন দিয়া ফিরিব। আমার ব্যারিষ্টার হইবার একান্ত বাসনা।”

কেহ বুঝিল কি না জানি না, আমি সকলি বুঝিলাম—তাঁহার প্রতিজ্ঞা টলিবার নয়। আমি পায়ে ধরিয়া না সাধিলে, ক্ষমা না চাহিলে তিনি ফিরিবেন না। সেই রাত্রেই মান অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পত্র লিখিতে বসিলাম, কতক্ষণে সে পত্র শেষ হইল। সে পত্রে যাহা লিখিলাম, কোন রমণী সে ভাবে কখনো লিখিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। কতবার কাতর ভাবে ক্ষমা চাহিয়া, কত ভালবাসিয়া, আদর করিয়া সে পত্র শেষ করিলাম। কতবার মিনতি করিয়া ফিরিয়া আসিতে লিখিলাম। লজ্জার মাথা খাইয়া আমাদের নূতন বন্ধনের কথা লিখিলাম। মনে নিশ্চয় জানিলাম যে, সে পত্র পাইয়াই তিনি ফিরিয়া আসিবেন। পত্র শেষ করিয়া রাখিয়া দিলাম। সে রাত্রি শুধু মিলন আনন্দের সুখস্বপ্নে কাটিয়া গেল। পরদিন অতি প্রত্যূষে দিদির মান্দ্রাজী আয়ার হাতে সে পত্রখানি দিয়া বেহারাকে ডাকে দিতে বলিলাম। সে দিন মেল ডে (বিলাতী ডাকের দিন) ছিল না, তবু সে পত্র ডাকে দিতে দিলাম। তাহার পর আশায় আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল।

চিটির উত্তর আসিবে—কি তিনি নিজে আসিবেন, কেবল তাহাই ভাবিতাম। প্রতি মেলডেতে হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত, বাতাসের শব্দে ঘন ঘন কম্পিত হইত—হয় ত তিনি সহসা আসিয়া পড়িবেন; যেমন সেই বিবাহের পূর্ব্বে হঠাৎ আসিয়াছিলেন। আহা! তাই যেন হয়। তার পর সে আশা ক্রমে দুরাশায় পরিণত হইল। মাসের পর মাস গেল, তিনি আসিলেন না, চিটিরও উত্তর আসিল না। প্রতি মেলে তিনি হয় মিঃ বসু বা দিদিকে পত্র লিখিতেন, কিন্তু তাহাতে; আমার নাম পর্য্যন্ত থাকিত না। ক্রমে চিটির উত্তরের আশায় নিরাশ হইলাম।

এইরূপে নিরাশার ঘোর অভিশাপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। বর্ষার শেষে একটি স্বর্গের কুসুম আসিয়া আমার অঙ্কে খসিয়া পড়িল। যখন আমি সন্তান প্রথম কোলে লইলাম, তখন সে তিন সপ্তাহের, কারণ সন্তান হইবার পরক্ষণ হইতেই আমি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যে দিন দিদি প্রথম তাহাকে আমার কোলে দিলেন, আমি আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না। সেই নবনীত-সুকুমার লাবণ্যময় সুন্দর মুখ দেখিয়া আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। স্বামীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা রমণীর একমাত্র বাঞ্ছনীয় হইলেও সন্তান-স্নেহ কি মধুর! সন্তান-স্নেহে যেন সারা পৃথিবী মধুর বিমল পুণ্যময় বলিয়া মনে

হয়। এ স্নেহে প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা নাই, এ স্নেহে শুধু নিঃস্বার্থ স্নেহরাশি দান করিবার কামনা জাগিয়া থাকে। আমার সেই সন্তান কোলে লইয়া চির-দুঃখিনী জনক-নন্দিনীর কথা প্রাণে জাগিয়া উঠিল। এই প্রকার বিনা অপরাধে স্বামি-হারা হইয়া তাঁহার প্রাণ আমারি মত দারুণ বেদনায় কাতর হইয়াছিল। কতবার মনে হইল সেই দূর সমুদ্র পারে ছুটিয়া গিয়া এই প্রাণের পুত্তলীকে তাঁহার কোলে দিয়া আসি। আমায় ভুলিলেও ভুলিতে পারেন, কিন্তু এ শিশু মুখ দেখিয়া তিনি আত্মহারা হইবেনই। আমার প্রাণে শুধু আশা ও নিরাশার আলো ছায়া জাগিয়া রহিল।

এই প্রকারে ছয়মাস কাটিয়া গেল। দিদি টেলিগ্রামে বেবির জন্ম সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অসুস্থতার সংবাদ দেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "বিদেশে একেলা আছে, অসুস্থতার সংবাদে মন খারাপ হইলে তাহার নিজের পীড়া হইবার সম্ভাবনা, আর জানইত তার মনে সুখ নাই।" আমি কিছুই বলিলাম না। সন্তান হইবার সংবাদ পাইয়া কোন উত্তর দিলেন না, বা আমার সংবাদ লইলেন না। দারুণ অভিমানে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল।

সময়ে সকলি সহিয়া যায়, দিবানিশি হৃদয়ে তুষানল জ্বালিয়া, দিন কাটাইতে লাগিলাম। প্রথম নিরাশার আঘাত সহিয়া গেলে আর তাহা তত তীব্র বোধ হয় না, অন্তস্তল পুড়িলেও বাহিরে পুড়াইতে পারে না। সারাদিন বেবিকে লইয়া তাহাকে খেলা দিয়া দিন কাটিতে লাগিল। স্বহস্তে তাহার ক্ষুদ্র ড্রেসগুলি (পোষাক) তৈয়ার করিতাম। আর লোকালয়ে যাওয়া আসা করিতাম না। কোন পরিচিত লোকজন আসিলেও ড্রইংরুমে যাইতাম। কখনো কদাচিৎ বেবির সহিত সন্ধ্যার সময় গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে যাইতাম। এই প্রকারে দিদির বাটিতে থাকিয়া আমার দিন কাটিতে লাগিল।

আবার একখানি পত্র লিখিবার বাসনা হইত, কিন্তু সন্তানের জন্ম সংবাদ পাইয়াও এতদিন একবার তাহার কুশল সংবাদ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন না, এই অভিমানে অপমানে আমি আর লিখিতে পারিলাম না। যদি বেবি না হইত, তাহা হইলে হয়ত আবার লিখিতে পারিতাম। কিন্তু আমার সে প্রথম পত্র, যাহাতে আমি রমণীর মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া, অত সাধিয়া লিখিলাম, তাহারও উত্তর দিলেন না। আমায় ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সন্তানের কি অপরাধ? অন্যের সন্তানে যাঁহার অসীম স্নেহ ছিল, নিজের সন্তানের প্রতি কি তাঁহার স্নেহ কণারও উদ্রেক হইল না? আমিত তাঁহাকে একবারও বিলাত যাইতে বলি নাই। সামান্য অপরাধে এই গুরুতর দণ্ড দিয়াও কি মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না। আমি অন্ধ—অবিশ্বাসে আত্মহারা

হইয়াছিলাম, তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে কলিকাতা হইতে কি অনুসন্ধান হইত না! বিলাত যাওয়া ছলমাত্র, আমার প্রতি দারুণ প্রতিশোধ লইয়াছেন।

যখন আমি বেবির ফটো তুলাইলাম, তাঁহাকে একখানি পাঠাইয়া দিলাম। ফটোর এক পার্শ্বে তাহার জন্মদিনের তারিখ টুকু লিখিয়া দিয়াছিলাম। এইরূপে একই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। এমন সময় সহসা দিদির মেয়ে চারু অতিশয় পীড়িত হইল। ঈশ্বরের অসীম কৃপায় সে কোনও প্রকারে সে যাত্রা রক্ষা পাইল। তখন ডাক্তারেরা তাহার বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। মিঃ বসু দেওঘরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। সেখানে তাঁহার একজন বন্ধুর একটি বাঙ্গলা ছিল। দিদি তাঁহার ছেলেমেয়ে-দিগকে ও আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। মিঃ বসু আমাদিগকে সেস্থানে স্থিতি করাইয়া দিয়া চলিয়া আসিবেন এই প্রস্তাব হইল।

আমরা নবেম্বরের শেষে যাইতেছিলাম, রাত্রে হিম লাগিবার ভয়ে, দিনের ট্রেণেই যাত্রা করিলাম। বেলা ৪টার সময় সেই স্থানে উপনীত হইলাম। কলিকাতায় যদিও আমরা ভাল কোয়াটারে থাকিতাম, সহরের গোলমাল কিছুই ছিল না, তবু দেওঘরে এই মুক্ত বাতাসে আসিয়া আমার বড় ভাল লাগিল। এখানে আর কেহ পরিচিত ব্যক্তি নাই, আমার ভয় ও সঙ্কোচ যেন ঘুচিয়া গেল। কলিকাতায় যখন কখনো কেহ আমার স্বামীর সহসা বিলাত যাত্রার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন আমার হৃদয়ে কি দারুণ অব্যক্ত যাতনা হইত! আমি কোন উত্তর না দিয়া নীরবে থাকিতাম। দিদি তাড়াতাড়ি বলিতেন, "সুকোর সব বাড়াবাড়ি—সিবিলিয়ান হয়েওত সাধ মেটে নাই, তাই ব্যারিষ্টারী দিতে গেল। এবার এ অবস্থায়ত আর পাঠান হয় না।" তখন প্রশ্নকারীরা নিরুত্তর হয়ে বলিতেন "তাই ত।"

দেওঘরে আমাদের গৃহটি কলিকাতার গৃহাপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। তিনটি শয়ন কক্ষ, একটি হল, তাহাই আবার ড্রইং এবং ডাইনিং রুমে বিভক্ত। তদ্ভিন্ন ড্রেসিং রুম ইত্যাদি ছিল, চারি পাশে বারান্দা। বিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ড, শীতের প্রারম্ভে নবীন শ্যাম দুর্ব্বাদল-মণ্ডিত এক পাশে টেনিস গ্রাউণ্ড। বাটীর চারি ধার লোহার রেলিংয়ে বেষ্টিত। বাটীর পশ্চাতে এক বৃহৎ পুষ্করিণী, তাহার ঘাট ও সিঁড়ি সান দিয়া বাঁধান। দুই পার্শ্বে দুই পুরাতন বৃহৎ বকুল বৃক্ষ, তাহার তলও সুন্দররূপে বাঁধান ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা আমার সেই স্থানটি অধিক প্রিয় হইয়াছিল। নির্জ্জনে যখন তখন সেই স্থানে আসিয়া বসিতে আমার বড় ভাল লাগিত।

কয়েক দিন মাত্র সেই স্থানে অপেক্ষা করিয়া মিঃ বসু কলিকাতায় চলিয়া

149

গেলেন। তিনি প্রতি শনিবার আসিয়া সোমবার চলিয়া যাইতেন, বিলাত হইতে পত্রাদি তাঁহার নিকট কলিকাতাতেই আসিত। এইরূপে বৎসর কাটিয়া গেল।

একদিন ডাকের পত্র পাইয়াই দিদি তাহা লইয়া আমার কক্ষে আসিয়া আমার হস্তে একখানা খোলা টেলিগ্রাম দিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছে, "আমি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। দেশে ফিরিয়া প্র্যাক্‌টিস করিব ভাবিতেছি, হয়ত শীঘ্রই যাইব।"

কত আশা উৎসাহে তিনি সিবিলিয়ান হইয়াছিলেন, সামান্ত একটা চিটি, একটা সন্দেহে তিনি জীবন-গতির পরিবর্ত্তন করিতে বসিয়াছেন। আমি নিতান্ত মন্দভাগিনী, আমার জন্ত তাঁহার সকল-দিক্‌ই ডুবিয়া গেল। দিদি চলিয়া গেলেন। আমি কিছু না বলিয়া বেবিকে বুকে চাপিয়া ধরিলাম। সকল দুঃখ নিবারণের সেই একমাত্র উপায়।

(ক্রমশঃ)।

ভগবৎ-শরণ-স্তোত্রম্।

(পরমহংসাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ-বিরচিতম্)

(১)

সচ্চিদানন্দরূপায় ভক্তানুগ্রহকারিণে।
মায়ানির্ম্মিতবিশ্বায় মহেশায় নমোনমঃ॥

সত্য-জ্ঞান-আনন্দের যিনি নিকেতন,
ভক্তের উপর যাঁর কৃপা অনুক্ষণ,
এ বিশ্ব হইল সৃষ্ট মায়াবলে যাঁর,
সেই পরাৎপর-পদে প্রণাম আমার!

(২)

রোগা হরন্তি সততং প্রবলাঃ শরীরং
কামাদয়োঽপ্যনুদিনং প্রদহন্তি চিত্তম্।
মৃত্যুশ্চ নৃত্যতি সদা কলয়ন্ দিনানি
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

আসিয়া দুর্জ্জয় রোগ শরীরে আমার
দিন দিন করিতেছে তারে ছারখার।
কাম-ক্রোধ-লোভ-আদি ষড়্ রিপুগণ
অনুদিন চিত্ত মোর করিছে দহন।
দিন যাইতেছে দেখি হাসিয়া হাসিয়া,
মৃত্যু ও গণিছে দিন আহ্লাদে নাচিয়া।
তাই ওহে দীনবন্ধু! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ!

(৩)

দেহো বিনশ্যতি সদা পরিণামশীল-
শ্চিত্তঞ্চ খিদ্যতি সদা বিষয়ানুরাগি।
বুদ্ধিঃ সদা হি রমতে বিষয়েষু নান্ত-
স্তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

মানুষের দেহ খানি নিতান্ত নশ্বর,
নষ্ট হইতেছে তাও দেখি নিরন্তর।
বিষয়-সম্ভোগ-সুখ চায় যেই মন,
খেদ করিতেছে তাহা সদাই এখন।
হায় রে বিষয়ে বুদ্ধি ফিরিছে সদাই,
তিলেক বিশ্রাম তার দেখিতে না পাই।
তাই ওহে দীনবন্ধু [illegible] দন—
তুমিই হইলে [illegible] রণ!